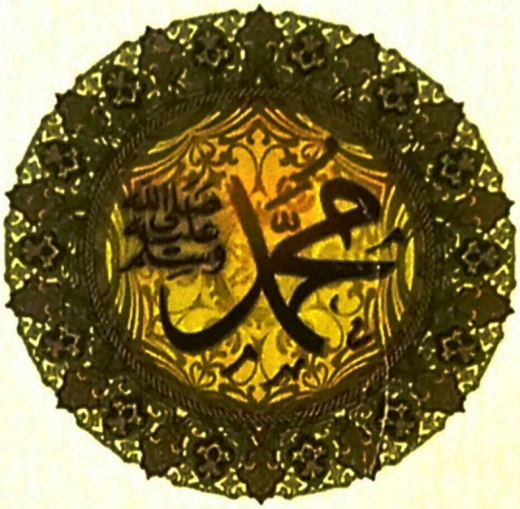


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দাস্তানে মুহাম্মাদ

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
শাইখ আহমাদ ইয্যুদ্দিন বায়ানূনী

ভাষান্তর : যায়েদ আলতাফ

দাস্তানে মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মূল

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দিন বায়ানূনী (র.)

ভাষান্তর

যায়েদ আলতাফ

আলেম, লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

আর রিহাব পাবলিকেশন্স

(বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙিনা)

দাস্তানে মুহাম্মাদ
শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দিন বায়ানূনী (র.)

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান

প্রকাশনায়
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
কওমী মার্কেট, ২য় তলা, ৬৫-৬৬/১, প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৯১০৭০৬০২৯, ০১৮৮৫৫২২৯৮৩

প্রচ্ছদ : আনাম সাজিদ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
sijdah.com
wafilife.com
niyamahshop.com
boibazar.com
pothikshop.com
ruhamashop.com
boipai.com
mollarboi.com

মুদ্রিত মূল্য : ৩৪০/-

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অর্পণ

আম্মা-আব্বাকে

‘ছেলে দুটোর তো মেধা ভালো। ওদের আপনারা চাইলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারেন।’ কতজন যে বলেছেন! কিন্তু তাঁরা কানে তুলেননি। সন্তানদের উপার্জনের ‘যাদুর কাঠি’ বানাতে চাননি। ক্ষণস্থায়ী পার্থিবজীবনকে প্রাধান্য দেননি। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দীনকে ভালোবেসেছেন। ছেলে দুটোকে হাফেজ-আলেম বানিয়েছেন। ওয়ারিশে নবী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাদের সুদীর্ঘ ও বরকতময় নেক হায়াত কামনায়।

যায়েদ আলতাফ



يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.

'হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি তাদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ (জান্নাত) রয়েছে।' (সূরা আহযাব : ৪৫-৪৭)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল এবং (এ রাসূল যাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন) তাদের মধ্যে আরও কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি (অর্থাৎ পরবর্তী উম্মত)। আর তিনি মহাক্ষমতাবান, মহাপ্রজ্ঞাবান।' (সূরা জুমুআহ : ২-৩)

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৯
শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৫
শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দিন বায়ানূনী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৪
ভূমিকা ২৭
জন্ম ৩০
জন্মগ্রহণের সময় প্রকাশিত মুজিযা ৩২
মুজিযা ও প্রকৃতির রীতি ৩৭
দুধপান ৪১
শৈশব ৪৪
যৌবন ৪৫
সকল নবীই মেষপালক ছিলেন ৫৩
আসমানী কিতাবসমূহে সুসংবাদ ৫৮
নবুয়তের পূর্বে ৬৪
নবুয়ত লাভ ৬৬
মানবকুলের কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা ৬৮
তিনি কেবলই একজন রাসূল কোনো নেতা নন ৭২
হিরাক্লিয়াসের স্বীকৃতি ৭৪
প্রিয় নবীজীর মুজিযাসমূহ ৭৯

মুজিযার শ্রেণিবিভাগ ৭৯
পবিত্র কোরআন ৮০
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ৮৩
খাবারে বরকত ৮৫
আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ৮৬
মিরাজের ঘটনা ৮৯

নবীজীর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ৯১
সকল নবী-রাসূল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ৯২
রেসালাতের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতা ৯৩
শাফায়াতের অধিকার প্রদান ৯৫

নবীজীর বর্ণিল আকৃতি ও সুমহান প্রকৃতি ১০১
নবীজীর প্রতি আদব ১১২
নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ১১৭
ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্বোত্তম পন্থা ১১৮
আমাদের কর্তব্য ১২৬

যে ছবি যায়না আঁকা

ভূমিকা ১৩৩
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ১৩৫
পূর্ণতা ও সৌন্দর্য ১৩৭
দৈহিক সৌন্দর্য ১৩৯
'আল-আমিন' উপাধি লাভের বিশ্লেষণ ১৪৪
স্বভাবগত বিষয়াদি ১৪৯
সমাজসংস্কার ১৫০
বীরত্ব ও সাহসিকতা ১৫২
ঘরোয়া জীবন ১৫৩
ইবাদতমগ্নতা ১৫৪
দানশীলতা ১৫৪
ক্ষমা ১৫৫
লজ্জাশীলতা ১৫৬
দুনিয়াবিমুখতা ও আখেরাতমুখিতা ১৫৬
সামাজিক জীবন ১৫৮
নবীজীর মজলিশ ১৬০
বিনয়নম্রতা ১৬১
চারিত্রিক অন্যান্য গুণাবলি ১৬৩
শেষ অসিয়ত ১৬৮
পরিশিষ্ট ১৬৯

অনুবাদকের কথা

এ দেশের ইসলাম পাঠকরা এটা জানেন যে, আমাদের ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন হয়েছে সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মাদ বিন কাসিম (র.)-এর ইতিহাসশ্রেষ্ঠ অভিযান সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে। অথচ এটা সত্য নয়; বরং প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব জালিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শে মুহাম্মদ বিন কাসিম এ ভূখণ্ডে আক্রমণ করেন। সিন্ধু জয়ের পূর্বেই বেশ কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পঞ্চম হিজরিতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে উসমান বিন আবি আবিল আস আস-সাকাফি ওমান থেকে ভারত সীমান্তে সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর ভাই মুগিরাকে দেবল (বর্তমান করাচি) যুদ্ধাভিযানে পাঠান। তিনি জলদস্যু ও অশুভ শক্তিগুলো পরাজিত করে ফিরে যান।

হযরত আলি ও আমিরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়েও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। তবে খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে ইরাকে বসরা নগরীর গভর্নর মুহাম্মাদ বিন হারুন নাসিরি উবায়দুল্লাহ বিন নবহাম ও বুদায়েল বিন তোহফা বিজলিকে পরপর যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। অবশেষে ৯৩ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন কাসেম জল ও স্থলপথে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। এটা ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের রাজনৈতিক এক মহাবিজয়।

নির্ভেজাল সত্য এই যে, এ ভূখণ্ডে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের অনেক আগেই। ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে। ইতিহাসশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ কাদেসিয়ার বিখ্যাত সিপাহসালার হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মহান পিতা হযরত আবু ওয়াক্কাস বিন উহাইব বিন মালিক (রা.) এসেছিলেন এ ভারতবর্ষের মাটিতে। একত্ববাদ ও তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে নৌপথে এসে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করেন। সুন্দরবনের কাঠ দিয়ে জাহাজের মেরামত করেন। এরপর কাফেলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এখান থেকে বেরিয়ে ইসলামের আলোকিত পয়গাম বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের

কাছে পৌঁছে দেন। চীনের ক্যান্টন বন্দরের পাশেই তাঁদের কবর রয়েছে।[১]

এ হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় জীবনের সম্পৃক্ততার নির্মোহ ইতিহাস। আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের রয়েছে হাজার বছর পূর্বের যোগসূত্র। ঐতিহাসিক এ যোগসূত্রের কারণেই হাজার মাইল দূরের এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের এত শক্ত অবস্থান।

আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের এক অনন্য দিক এটি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশাতেই ইসলামের দাওয়াত আমাদের দুয়ারে এসেছে। তখন থেকেই ইসলামের সুবাতাস এ অঞ্চলের আকাশে বইতে থাকে। পরবর্তী সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লিখে ইসলামের আলোকিত পথের দাওয়াত দেন, তখন ওহাব বিন আবি কাবশা (রা.)-কে চীনের সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে চীনে গিয়েছিলেন বলে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

তাই ইসলামের শুরু লগ্ন থেকেই এদেশে ইসলামের সুশীতল বাতাস বইতে থাকে। কিন্তু চরম আফসোস, এমন বিরল ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী এ দেশের মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ থেকে যোজন যোজন দূরে।

আধুনিককালে মানুষের শিক্ষদীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত। পাশাপাশি পাঠাভ্যাসও বৃদ্ধি পেয়েছে সমানতালে। মানুষ বই, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়ার কল্যাণে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শিক্ষাসংস্কৃতি গিলছে গোগ্রাসে।

অথচ অধিকতর পাঠাভ্যাস ও অধ্যয়নযোগ্য করে তোলার প্রয়োজন ছিল রাসূলে আরাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত। কেননা, যুগ যুগ ধরে মানুষ যে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা, মেধা ও মুক্তির সাধনা করে এসেছে, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সেসব পূর্ণতা পেয়েছে। মানুষের সততা, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, মনুষ্যত্ব তথা মানবিক গুণাবলির সামগ্রিক সাধনা তাঁর মাঝে এসে চূড়ান্ত আকৃতি লাভ করেছে।

---

[১].তুহফাতুল মুজাহিদীন।

তাঁর জীবনাদর্শ মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। তাঁর গোটা জীবন ইসলামের প্রকৃত রূপ। সুতরাং একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়তে হলে প্রিয়তম রাসূলের জীবনী অধ্যয়ন করা, তাঁর তথ্যপূর্ণ সীরাত সংক্রান্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ বই পড়া একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা এই যে, নিত্যনৈমিত্তিক প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য সম্পর্কে, তাদের নন্দিত ব্যক্তিদের নিত্যনতুন তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের পড়াশোনা ও গবেষণা সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত হলেও সীরাত অধ্যয়নে উম্মতের অবহেলা ও উদাসীনতা ব্যাপক। তারপরও এটা চিরন্তন সত্য যে, আমাদের ইহ-পারলৌকিক সবকিছুই আবর্তিত হয়ে থাকে নবীজীর আদর্শিক জীবন ও সাধনাকে সামনে রেখে। ফলে সর্বকালে সর্বদেশে সমগ্র মানবজাতির জন্যই তাঁর আদর্শিক জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাই পৃথিবীর যে-কোনো কালে, যে-কোনো দেশে ও যে-কোনো সমাজে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ যতোটুকুই আঁকড়ে ধরেছে, তারা ততটুকুই হয়েছে নন্দিত ও আলোকিত। আর যারা যতটুকুই ছেড়ে দিয়েছে তারা ততটুকুই হয়েছে নিন্দিত ও স্খলিত। সুতরাং ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ বুঝতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নববী আদর্শ জানা ও বোঝার বিকল্প নেই।

প্রিয়তম রাসূলের পূর্ণ জীবনই তো আমাদের পরম আদর্শের নির্ভুল ঠিকানা।

পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জীবনের আদর্শ।

পৃথিবীর কত মানুষ যে তাঁকে নিয়ে লিখেছে! তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

তবু যেন লেখা শেষ হয় না! আর কখনো শেষ হবেও না!

শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনচরিত নিয়ে গল্প, কবিতা, ছড়া কোনো কিছুরই লেখার শেষ নেই। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে প্রিয় নবীর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত পরিপূর্ণ বর্ণনা করা কখনোই সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস, ইতিহাস, সাহাবি ও পূর্ববর্তী আলেমদের নির্ভেজাল অভিমতগুলোই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই যুগে যুগে আলেম, লেখক, গবেষক ও সত্যানুসন্ধানীরা এসব মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনের নানান দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন, লিখেছেন এবং উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর গ্রন্থ সংখ্যা কত, তার হিসেব বের করা বেশ কঠিন।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে দামেশকের *আল-মুকতাবিস* পত্রিকা একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিলো। সেখানে তারা বলেছিল, 'শুধু ইউরোপেই বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর তেরোশর বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।'

আরব বিশ্বের লেখকগণ এ পরম সৌভাগ্য কুড়িয়েছেন কোচরভরে। এই ক্ষেত্রে তারা অগ্রজ ও অনুসরণীয়।

বক্ষ্যমাণ '*দাস্তানে মুহাম্মাদ*' গ্রন্থটি আরবি قَبَسَاتٌ مِنْ نُوْرِ النُّبُوَّةِ (কাবাসাতুম মিন নূরিন নবুয়াহ) শীর্ষক আরবি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, যার লেখক শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ও শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দীন বায়ানূনী (র.), দীনি ইলমে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী গত শতাব্দীর দুজন খ্যাতনামা বিদগ্ধ মনীষী।

ইসলামী রচনাসম্ভারে এই দুই মহান স্কলারের শক্তিশালী কলমের কালি-সিঞ্চিত লেখা এ উম্মাহর আলোকপথের দিশারি হয়েছে বারবার। *কাবাসাতুম মিন নূরিন নবুয়াহ* গ্রন্থটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য মহান এই শাইখদ্বয়ের লেখা সীরাত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই গ্রন্থটি তারা যৌথভাবে রচনা করেছিলেন। এটি রচনার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অপবাদ আরোপকারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কথা খণ্ডন করা।

সিরিয়ায় তখন নতুন এক ফেতনা দেখা দিয়েছিল। এমন একদল লেখক বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়েছিল; যারা প্রিয় নবীজী সম্পর্কে অবান্তর কিছু প্রশ্ন তুলেছিল। এর পেছনে তাদের ঘৃণ্য একটি উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম যুবসমাজকে ইসলাম ও নববী আদর্শের আলোকিত অভিযাত্রা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। অথচ মহান রাব্বুল আলামিন মানবজাতির সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের অনুপম এক দিশা রেখেছেন প্রিয়তম রাসূলের আলোদ্ভাসিত নববী আদর্শের অনুপম পাদরেখায়।

এ মহান লেখকদ্বয় উম্মাহর সন্তানদের নববী আদর্শের পথ থেকে সরিয়ে রাখার সেই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। সেসব বিপথগামীদের নাম ও

তাদের আরোপিত প্রশ্নের উল্লেখ না করেই উত্তর দিয়েছিলেন সাবলীল গতিতে। প্রাঞ্জল ভাষায়। তারা মূলত দীনবিদ্বেষী এসব সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই এমন দলিলভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে এ কিতাবটি বাতিলের সামনে উত্থাপিত অনন্য গ্রন্থ। তাই এটি লেখকদ্বয়ের চিন্তা গবেষণার অনন্য ফসল।

এ গ্রন্থটি রচনার মহান আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম তরুণ ও যুবসমাজকে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র জীবনচরিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ ও সুমহান ব্যক্তিত্বের আলোকিত দিক তাদের সামনে তুলে ধরা।

এ ক্ষেত্রে লেখকদ্বয় শতভাগ সফল। আমি শুধু আমার দুর্বল হাতে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পাঠকের ভালো লাগবে।

১৩৭০ হিজরি মোতাবেক ১৯৫১ সালে *কাবাসাতুম মিন নূরিন নবুয়াহ* গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন শাইখ আব্দুল মাজিদ বায়ানূনী (র.)। মূল গ্রন্থটির শেষে তিনি তাঁর রচিত وَمَضَاتٌ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ الْخَاتَمِ (ওমাযাতুম মিন হাদয়িন নাবিয়্যিল খাতাম) শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত রেসালাহ (পুস্তিকা) সংযুক্ত করে দেন। এতে তিনি নবীজীর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের শুভ্রতা ও অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা তুলে ধরেছেন অতি সুনিপুণভাবে। সীরাতপ্রেমীদের রাসূল-প্রেমের মদিরায় বিভোর ও বিমত্ত করে তুলতে 'যে ছবি যায়না আঁকা' শিরোনামে সে অংশটিরও অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

শেষ কথা

রাসূলে খোদার সীরাত মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। সীরাত অনুসরণ-অনুকরণ ও দৈনন্দিন জীবনে এর বাস্তবায়ন ছাড়া কারও পক্ষেই পার্থিব কিংবা অপার্থিব কোনো সফলতার আশা করা বোকামি। ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযী (র.) বলেন, 'যেহেতু দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা ও চূড়ান্ত মুক্তির সৌভাগ্য প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল; তাই জীবনে কল্যাণ, সফলতা ও সৌভাগ্যপ্রত্যাশী প্রতিটি মানুষ যেনো নবীজীর সীরাত পড়ে। তাহলে সে নিজেকে রাসূলের সত্যিকার অনুসারী

হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।'

আমি নিজেকে সেই পরম সৌভাগ্যশীলদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত দেখতে চাই। পরকালে কঠিন মুহূর্তে যেন আমার আদর্শ ও ভালোবাসা প্রিয়তম রাসূলের শাফায়াত লাভে ধন্য হই, এ প্রত্যাশায় সীরাত অনুবাদকর্মের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

যেহেতু আমরা মানুষ; ভুলের উর্ধ্বে নই, তাই মানবসুলভ ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সহৃদয়বান কারও দৃষ্টিতে এমন কিছু পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। কৃতজ্ঞচিত্তে পরবর্তী সময়ে আমরা তা সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকব; ইনশাআল্লাহ। বইটি ও বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ কবুল করুন। আমাকে ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী হয়ে নববী আদর্শে জীবন গঠনের তৌফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ঢাকা ॥ ০২ জানুয়ারি ২০২০ **যায়েদ আলতাফ**

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আবদুল ফাত্তাহ বিন মুহাম্মাদ বিন বাশীর বিন হাসান আবু গুদ্দাহ আনসারী।

বংশপরিচয় : তিনি বিখ্যাত সাহাবি খালেদ বিন ওলীদ (রা.)-এর বংশধর। তাঁর বংশধারা এই মহান সাহাবির গোত্র মাখযূম পর্যন্ত পৌঁছেছে। শাইখের পরিবারের কাছে এই বংশ তালিকা সংরক্ষিত রয়েছে।

জন্ম : ১৯১৭ সালের ৭ই মে মোতাবেক ১৩৩৬ হিজরির রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিরিয়ার হালব শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিবার : একটি মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর পরিবার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তারা সায়াত নামক হাতে বোনা কাপড় তৈরি করত।

পিতার নাম : মুহাম্মাদ আনসারী। খুব ধার্মিক লোক ছিলেন। অধিক কোরান তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। উলামায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বাত রাখতেন। তাদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন ও তাদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে উপকৃত হতেন।

প্রাথমিক শিক্ষাজীবন : শাইখের বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর দাদা তাকে একটি মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর শাইখ মুহাম্মাদ আলী আল-খতিবের[২] মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে সুন্দর হস্তলিপি শিক্ষা করেন। কয়েক মাস পর সেখান থেকে চলে আসেন।

উচ্চশিক্ষালাভ : উনিশ বছর বয়সে সিরিয়ার হালব শহরে অবস্থিত বিখ্যাত মাদরাসা খুসরুয়ীয়্যায় ভর্তি হন।[৩] সেখানে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত

---

[২].তিনি হালবের খতিব ছিলেন।

[৩].উছমানি সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী খসরু পাশা ছিলেন এই মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাতা।

কৃতিত্বের সঙ্গে লোখাপড়া করেন। সমস্ত ক্লাসেই তিনি সেরা ছাত্র ছিলেন।

১৯৪৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরের রাজধানী কায়রো গমন করেন। 'আল-আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ অনুষদে ভর্তি হন। পাঁচ বছর পড়াশোনার পর ১৯৪৮ সালে স্নাতকোত্তর হন।

এরপর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েই আরও দুবছর আরবি ভাষা অনুষদে বিশেষ শিক্ষাকোর্স 'তাখাসসুস ফি উসুলিত তাদরিস' অধ্যয়ন করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর এই কোর্স সম্পন্ন হয়। তারপর জন্মস্থান হালব শহরে ফিরে আসেন।

উস্তাযগণ : মাদরাসা খুসরুয়ীয়্যায় তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শাইখ রাগেব তাব্বাখ, শাইখ আহমাদ আয-যারকা, শাইখ ঈসা বায়ানূনী (এই শাইখের প্রভাব তাঁর মাঝে সবচেয়ে বেশি ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও সেটি বলেছেন।), শাইখ আসআদ আবজী, শাইখ আহমাদ কারদী, শাইখ নাযিব সিরাজুদ্দিন, শাইখ মুসতাফা আহমাদ যারকা, শাইখ ইবরাহিম সালকীনী (র.)।

জামেয়া আযহারে তিনি যাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– শাইখ খিযির হুসাইন, শাইখ আব্দুল মাযিদ দারায, শাইখ আব্দুল হালিম মাহমুদ, শাইখ মাহমুদ শালতুত, শাইখ আব্দুল্লাহ সিদ্দিক আল-গামরী, শাইখ মুহাম্মাদ আবু যুহরা (র.) প্রমুখ।

মিশরে তিনি শাইখ মুসতাফা সবরী , শাইখ মুহাম্মাদ যাহেদ কাওছারী, শাইখ হাসানুল বান্না (র)–এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি শাইখ যাহেদ কাওছারী (র.)-এর বিশেষ ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অনেক উপকৃত হন। ১৯৪৪-৫০ সাল পর্যন্ত মিশরের কায়রোতে থকাকালীন শহীদ হাসানুল রান্না (র.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর দল 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনে' (মুসলিম ব্রাদারহুড) যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। তারপর সেখানের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য হন। ১৯৭২-৭৬ এবং ১৯৮৬-৯০ পর্যন্ত দুবার সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শীর্ষ নেতার পদে মনোনীত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

ইলমী সফর : বিভিন্ন অঞ্চলের বহু দেশে তিনি ইলমী ও দাওয়াতী সফর করেন। এসব সফরে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তিনি যেমন ঋদ্ধ হয়েছেন তেমনি মানুষও তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

ভারত, পাকিস্তান, সুদান, মরক্কো, ইরাক সফর করেন এবং এসব দেশের অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারত-

পাকিস্তান সফরের সময় অত্র অঞ্চলের খ্যাতনামা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের রচিত মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করে নিয়ে যান। তারপর সেগুলো তাহকীক (পরিমার্জন, পুনর্যাচাই ও বিশ্লেষণ) করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রকাশ করেন।

এসব দেশে গিয়ে তিনি যে সকল শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলেমের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– পাকিস্তানের তৎকালীন সময়ের প্রধান মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ শফী, দিল্লির শীর্ষস্থানীয় আলেম শাইখ আতিকুর রহমান, শাইখ মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী, শাইখ মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলভি, শাইখ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিননূরী, শাইখ মুহাম্মাদ লতিফ, শাইখ আবুল ওফা আল-আফগানী, শাইখ আবুল আলা মওদুদী, শাইখ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন নদভী (র.) প্রমুখ।

ইলমী ও দাওয়াতী কার্যক্রম : ১৯৫০ সালে তিনি মিশর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর দীর্ঘ এগারো বছর সিরিয়ার হালব শহরে একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করেন। তিনি এ বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে সাপ্তাহিক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করতেন । সেখানে তিনি ছাত্রদের দীনী তারবিয়াত ও শিক্ষা প্রদান বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। শিক্ষকদের সমস্যা ও অসুবিধার কথা শুনতেন এবং তাঁদের যথাযথ সমাধান দিতেন।

মাদরাসার নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দিন বায়ানূনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা শা'বানিয়া ও মাধ্যমিক শারইয়্যাহ মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এ দুটিই ছিল মাদরাসায়ে শারইয়্যাহ।

দামেশকের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শরীয়াহ অনুষদের (ধর্মতত্ত্ব) অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফিকহে হানাফি, উসূলুল ফিকহ ও ফিকহে মুকারীন (তুলনামূলক ফিকহ) বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এ সময়ে তিনি ইবনে হাজাম জাহেরী রচিত *মাওসুআতু মুজামি ফিকহীল মুহাল্লা* নামক একটি বিশ্বকোষ গ্রন্থের কাজ সম্পন্ন করেন।[৪] দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রকাশনা বিভাগের অধীনে কিতাবটি ঢাউস সাইজের দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

---

[৪] শাইখের পূর্বে আরও দুজন অধ্যাপক কাজটি শুরু করলেও তারা তা সম্পন্ন করতে পারেননি।

সত্যপ্রকাশে নির্ভীক : ১৯৬২ সালে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে হালব শহরের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। ন্যায়প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষদে তাঁর কার্যকরি ভূমিকা ছিল।

দীনের পথে তিনি নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হন। সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সালাহ জাহিনের রোষানলে পড়েন। তাকে এগারো মাস কারাবরণ করতে হয়। কারণ, তিনি তার হিংসাত্নক নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের পর ক্ষমা করার অংশ হিসেবে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে সিরিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপর তাকে সিরিয়া ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

কর্মজীবন : ১৩৮৫ হিজরিতে তিনি সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। সেখানে তিনি শরীয়া অনুষদের শিক্ষক হিসেব কাজ করেন। তিনি রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চতর জুডিশিয়াল ইনস্টিটিউটেও অধ্যাপনার কাজ করেন। মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রীর অধ্যাপক ছিলেন। থিসিস পেপারের (গবেষণা পত্রের) সুপারভাইজার ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক প্রফেসর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ অনুষদের শিক্ষা সিলেবাস, উচ্চতর জুডিশিয়াল ইনস্টিটিউটের সিলেবাস প্রণয়ন ও সিলেবাসের মানোন্নয়নে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মজলিশে ইলমীর সদস্য হিসেবে মনোনীত হন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিরাট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

তারপর কিং সাউদ ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর সিলেবাসের মানোন্নয়নে কাজ করেন। ইন্তেকালের কয়েক বছর আগে তিনি কর্মজীবন থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। তারপর জ্ঞান, গবেষণা ও সংকলনের কাজে মনোনিবেশ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

অর্জন : সুদানের উম্মে দিরমান ইসলামী ইউনিভার্সিটি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইউনিভার্সিটির তিনি ভিজিটিং প্রফেসর (আমন্ত্রিত অধ্যাপক) ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বহু কনফারেন্স ও সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাবেতা আল-আলামী আল-ইসলামীর মজলিশে তাসীসের (প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের) সদস্য ছিলেন।

ইসলামীক স্টাডিজের অক্সফোর্ড সেন্টার শাইখকে হাদিস, হাদিসশাস্ত্র ও ইসলামীক স্টাডিজে অনবদ্য অবদান রাখায় আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। ব্রুনাইয়ের বাদশাহ এওয়ার্ডটি তাঁর হাতে তুলে দেন।

ইলমী যোগ্যতা : শাইখ (র)-কে উনবিংশ শতাব্দির অন্যতম খ্যাতিমান নির্ভরযোগ্য বিদগ্ধ মহান আলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি আমাদের মুসলিম বিশ্বের গর্ব। শরয়ী ইলমের বহু বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একাধারে তিনি ছিলেন মুহাদ্দিছ, ফকীহ, উসূলবিদ, নাহুবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক। বিশেষত ফিকাহশাস্ত্র ও হাদিসশাস্ত্রে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। জ্ঞানের নিসীম সাগর ছিলেন তিনি।

রচনা : তিনি ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রের ওপর রচিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তাহকীক (পরিমার্জন, পুনর্যাচাই ও বিশ্লেষণ) করে প্রকাশ করেন। তাঁর তাহকীকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তাহকীককৃত কিতাবটির সঙ্গে অন্য একটি পুস্তিকাও ছাপেন। সেই পুস্তিকাটি হয় দুর্লভ তত্ত্ব ও তথ্য, উপকারী বিশ্লেষণ ও গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জনে সমৃদ্ধ।

নিম্নোক্ত উক্তিটির যথার্থ রূপ ছিলেন তিনি-

'পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কত কাজই না রেখে গিয়েছেন।'

শাইখের রচিত ও তাহকীককৃত কিতাবের সংখ্যা সত্তরেরও অধিক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো– *ছাফাহাতুম মিন ছাবরিল উলামা, কি-মাতুয যামান ইনদাল উলামা, আল-উলামাউল উযযাব, মিন আদাবিল ইসলাম, আর রাসূলুল মুআল্লিম, লামাহাতুম মিন তারিখিস সুন্নাহ ও উলুমিল হাদিস, আল ইসনাদু মিনাদ দিন, উমারাউল মুমিনীনা ফিল হাদিস* প্রভৃতি।

তাঁর লেখনী ছিল সুউচ্চ সাহিত্যমান, উন্নত ভাষারুচি, সুন্দর শব্দ ও বাক্যচয়নগুণ সম্পন্ন। শরয়ী বিষয় যেমন, ফেকাহ ও উসূলে ফেকাহর মতো সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মাঝে এমন সাহিত্যযোগ্যতা বিরল।

শাইখ রহিমাহুল্লাহর ইলমী কিতাবাদির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। প্রাচীন কিতাবাদির আসল পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করতেন। তারপর সেগুলোর পেছনে যথেষ্ট সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতেন এবং যথাযথ পরিমার্জন করে পাঠকের সামনে সম্পূর্ণ নতুন, ঝকঝকে, উন্নত ও হৃদয়গ্রাহীরূপে পেশ করতেন।

দাওয়াতী কার্যক্রম : সিরিয়ায় থাকাকালীন শাইখ রহিমাহুল্লাহ যেন একটি ভ্রাম্যমাণ দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তিন প্রজন্মেরও অধিক দাওয়াতী কর্মী নিজ হাতে তৈরি করেছেন। এরা সবাই তাঁর তালীম, তারবিয়াত ও দীক্ষাগুণে ইসলামী চেতনাদীপ্ত হয়ে গড়ে উঠেছিলেন।

মজলিশ : জুমআর খুতবার পাশাপাশি শাইখের সাপ্তাহিক তিনটি মজলিশ অনুষ্ঠিত হতো।

১.জুমুআর নামাজের পর মাদরাসা খুসরুয়িয়্যায় অনুষ্ঠিত দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের মজলিশ। তিনি এই মজলিশের নাম দিয়েছিলেন 'জালসাতুত তাফাক্কুহ ফিদ্দিন' (দীনের গভীর বোধ ও অন্তর্জ্ঞানের মজলিশ)। সেখানে শাইখ কোরান-হাদিসের আলোকে যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার যুগোপযোগী উত্তর ও সমাধান দিতেন। শরীয়তের যাবতীয় দলিল-প্রমাণসহ ফতোয়া প্রদান করতেন। এর সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ দিকনির্দেশনাও প্রদান করতেন।

২. প্রতি সপ্তাহের সোমবার মাগরিবের পর অনুষ্ঠিত ফিকহের মজলিশ। সেখানে তিনি ফিকহের দলিলভিত্তিক আলোচনা করতেন। বিভিন্ন মাজহাবের ওপর তুলনামূলক আলোচনা পেশ করতেন। উপস্থিত সবাই যেন তাঁর গভীর জ্ঞানসরোবরে অবগাহন করতো। ফিকহী বিষয়বস্তুর আলোচনার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় ও ঈমানী দিকনির্দেশনার সংমিশ্রণ ঘটাতেন। যার ফলে উপস্থিত লোকেরা মজলিশ থেকে ইলমী ও ঈমানী দাওলাত হাসিল করতো। জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পদ লাভ করতো।

৩. বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত পবিত্র হাদিস, জীবন ও চরিত্র-গঠনমূলক এসলাহী মজলিশ। সেখানে কিছু সময় তিনি সহীহ মুসলিম পাঠ করতেন।

ছাত্র : তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হলেন : শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা, পাকিস্তানের মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, বাংলাদেশের মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ড. তাকিউদ্দিন নদভী মাযাহেরী (দা. বা.) প্রমুখ।

ব্যক্তিত্ব : একজন হক্কানী আলেম, দায়ী ও মুজাহিদ হিসেবে শাইখ খুবই ভারসাম্যপূর্ণ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের এবং যুগসচেতন ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উম্মতের চিন্তায় বিনিদ্র রাত কাটাতেন। তাদের ব্যথায় ব্যথিত ছিলেন। চেহারায় সর্বদা গাম্ভীর্য ছেয়ে থাকত। মিষ্টভাষী। তাঁর সঙ্গীরা কখনো তাঁর প্রতি বিরক্ত হতো না। উপস্থিত সকলে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সদুত্তর, কথার মিষ্টতা ও যাদুময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। অনর্থক ও অতিরঞ্জিত কথা পরিহার করে চলতেন। সবকিছুকে শরীয়তের মানদণ্ডে মাপতেন। অন্ধভাবে কোনো ব্যক্তির কিংবা নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করতেন না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানই এর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ। কারণ, শাইখের সমসাময়িক কিছু জনপ্রিয় আলেম ছিলেন, যারা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) সম্পর্কে প্রান্তিকতার শিকার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যায় কথা বলতেন।

কিন্তু শাইখ আবদুল ফাত্তাহ (র.) তাঁর সম্পর্কে ন্যায়ানুগ কথা বলতেন। তাঁকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা দিতেন। ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করে তাঁর অবস্থান তুলে ধরতেন। ইলমী ময়দানে তাঁর সুমহান কীর্তি, জিহাদের ময়দানে তাঁর বীরত্বগাঁথা এবং দীনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল কুরবানির কথা বর্ণনা করতেন। ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর প্রতি শাইখের এই ন্যায়ানুগ ও ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছ থেকে তাঁর ছাত্র ও ভক্তবৃন্দও লাভ করেছিল।

আখলাক ও চরিত্র : শাইখ আবদুল ফাত্তাহ (র.) ছিলেন বহু চারিত্রিক ও মানবিক গুণের আধার। দানশীল, মহৎ, অতিথিপরায়ণ, সহনশীল, ধৈর্য ও ক্ষমাশীল, ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী, আত্মমর্যাদাশীল ও ন্যায়পরায়ন একজন মানুষ। মুখে কাউকে কোনো কষ্ট দিতেন না। কদাচিৎ রাগ করতেন। অধিকাংশ সময় সেটাও হতো একমাত্র আল্লাহর জন্য। সাথি-সঙ্গীদের সম্মান করতেন। তাদের প্রশংসা করতেন এবং তাদের সঙ্গে নম্র ও মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। খুব মেপে মেপে কথা বলতেন এবং ভেবে-চিন্তে কাজ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন:

'সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধি খাটাও।'

খুব রসিক ও মজার মানুষ ছিলেন। সাথি-সঙ্গীদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। তবে পরিমিতিবোধ বজায় রাখতেন। মজলিশের শান বজায় রেখে তিনি তাঁর ইলমী ও তারবিয়াতী মজলিশগুলোতেও রসিকতা করতেন। এতটা গুরুগম্ভীর হতেন না যাতে সাথি-সঙ্গীরা বিরক্তিবোধ করে।

পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, জীবনযাপন সবকিছুতে তিনি অত্যন্ত পরিপাটি সুশৃঙ্খল ও রুচিবোধসম্পন্ন ছিলেন। স্বল্পভাষী । বাকসংযমী । যে যত মন্দ আচরণ করুক, কাউকে কখনো গালমন্দ করতেন না।

বিপদাপদে ধৈর্যশীল ও আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল। আবাসে-প্রবাসে, দেশে-বিদেশে, সুস্থতা-অসুস্থতা সর্বাবস্থায় প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করতেন। এ ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন। সন্তান-সন্ততিদেরও নামাজের প্রতি যত্নবান করে গড়ে তুলেছিলেন। তাদের অন্তরে নামাজের মহব্বত দৃঢ় করে দিয়েছিলেন। কখনো যদি ঘুমন্ত কিংবা ক্লান্ত থাকতেন, আর তাকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো, দ্রুত উঠে নামাজ আদায় করে নিতেন। মাঝে মাঝে তিনি উমরে ফারুক (রা)-এর আহত হওয়ার পর মৃত্যুশয্যার ঘটনাটি উল্লেখ করতেন। তখন তিনি তাঁর এই বাণীটি সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতেন,

'নামাজ ত্যাগকারীর ইসলামে কোনো অংশ নেই।'[৫]

তাঁর প্রতিদিন কোরান তেলাওয়াতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল। একান্ত নিরুপায় না হলে কখনো তা ছুটতো না। অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতেন। সময়ের খুব মূল্য দিতেন। একটি মুহূর্তও নষ্ট করতেন না। সব সময় হয় কোনো গ্রন্থ রচনা করছেন কিংবা তাহকিক করছেন । অথবা কোনো মাসআলা অনুসন্ধান করছেন কিংবা মুতালাআ (অধ্যয়ন) করছেন। অন্যথায় বসে বসে তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করছেন। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করছেন।

খুব আবেগপ্রবণ ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যখনই তাঁর সামনে মুসলিম উম্মাহর কোনো ট্রাজেডি ও দুঃখজনক ঘটনার আলোচনা হতো কিংবা তাঁর প্রশংসা করা হতো, তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠতো।

উম্মতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার কথা শুনে দরদ ও ব্যথায় তিনি ক্রন্দন করতেন। একবার তিনি বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের করুণ অবস্থার কথা শুনে মর্মবেদনায় ডান কানের শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কীভাবে?

তিনি এতটাই ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন যে, সারা রাত এক ফোটা ঘুমোতে পারেননি। পরদিন সকালে দেখতে পেলেন ডান কান দিয়ে রক্ত

---

[৫] মুয়াত্তা মালেক ১ : ৩৯। তাবাকাতে ইবনে সাদ ৩ : ৩৫০। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১৬৪। মুসান্নাফে আবদির রাযযাক : ১৫০। মারওয়াযি : ৯২৩।

পড়ছে। তারপর থেকে তিনি সেই কানের শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

এরপর সমস্যা দেখা দেয় তাঁর চোখে । আল্লাহ তাআলা তাকে আরও পরীক্ষায় ফেলেন। কিন্তু এ নিয়ে তিনি কখনো অভিযোগ ও অনুযোগ করেননি এবং তা তাকে ইলমী গবেষণা থেকেও দূরে রাখতে পারেনি; বরং সবর ও সন্তুষ্টির সঙ্গে আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হাতে আর বেশি সময় নেই। যে কোনো সময় মাওলার সান্নিধ্যে যাওয়ার ডাক চলে আসতে পারে। তাই কিছু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কায় অধ্যাবসায়ের সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন। এমনটিই আমাদের ধারণা।

ইন্তেকাল : ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪১৭ হিজরির ৯ই শাওয়াল রবিবার ভোরে রিয়াদ শহরে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ছয়দিন-কম একাশি বছর তিন মাস।

সোমবার জোহরের নামাজের পর রিয়াদের তারজিহী মসজিদে তাঁর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিমানে করে তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়া হয়। এশার নামাজের পর মসজিদে নববীতে তাঁর দ্বিতীয় জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। তাঁর সওয়াবকে বৃদ্ধি করুন। আপন সন্তুষ্টি দানে তাঁকে সম্মানিত করুন। জান্নাতে তাঁর আবাসস্থল করুন এবং মুসলিম উম্মাহকে তাঁর বিয়োগব্যথায় উত্তম বিনিময় দান করুন।

শাইখ আহমাদ ইযযুদ্দিন বায়ানূনী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আহমাদ আস-সাইয়াদ। উপাধি : ইয্যুদ্দিন, ঈসা আল-বায়ানূনী।

জন্মস্থান : সিরিয়ার হালব শহরের প্রায় পনেরো কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রামের নাম বায়ানূন। তাঁর পিতা শাইখ ঈসা বিন হাসান বায়ানূনীর জন্ম এখানেই । এই গ্রামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে বায়ানূনী বলা হয় এবং এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীকালে শাইখ ঈসার বড় ভাই শাইখ হাম্মাদাহ তাঁর পড়াশোনার জন্য তাঁকে এখান থেকে হালব শহরে নিয়ে যান। ধীরে ধীরে তিনি এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং এখানেই তাঁর ঔরসে ইযযুদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই বায়ানূন শাইখ ইযযুদ্দিনের পিতৃভূমি হলেও হালব তাঁর জন্মভূমি। হালবের আলো-বাতাসেই তাঁর বেড়ে ওঠা।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা : ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৩০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলেম। একটি দীনী ও ইলমী পরিবারে তিনি বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ও পিতার সমসাময়িক হালব, সিরিয়া, হারামাইন শরিফাইন ও মুসলিম বিশ্বের অনেক বড় বড় আলেমের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন : মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি কোরান খতম করেন। তারপর সরকারি ইবতেদায়ী মাদরাসায় ভর্তি হন। পড়ালেখার বিভিন্ন স্তর শেষ করে দারুল মুআল্লিমীনে দুই বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। এই কোর্সের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হয়। তারপর তালীম ও তারবিয়াতের ময়দানে কাজ করেন। ১৯৩২-৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি দাওয়াতী কার্যক্রম ও যুবসমাজকে ইসলামী দীক্ষার গুণে গড়ে তোলার পেছনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে অবসরে চলে যান।

দাওয়াতী কর্মকাণ্ড : সামাজিক ও দাওয়াতী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এসব ক্ষেত্রে তিনি উলামায়ে কেরাম ও দীনের দায়ীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। সাধারণ বিষয়াদিতে উলামায়ে কেরামের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি শুধু আগ্রহী নয়, সচেষ্টও ছিলেন।

জামে উছমানি মসজিদের খতিব ও জামে আবু যর মসজিদের ইমাম হিসেবে তিনি তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৬৫ সালে একটি দাওয়াতী ও তারবিয়াতী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি 'জামে আবু যর' মসজিদ থেকে অব্যাহতি নেন। তারপর যুবকদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তাদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেন। তাঁর এই দাওয়াহ বিষয়ক মাদরাসা অনেক মুসলিম দেশে প্রসার লাভ করে এবং অন্যান্য দাওয়াহ বিষয়ক মাদরাসার সঙ্গে ইসলামী পুনর্জাগরণে অবদান রাখে।

ব্যক্তিত্ব : তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন : সততা, স্পষ্টবাদিতা, সত্যানুরাগ, সত্যানুসরণ এবং সত্যের পথে জীবন উৎসর্গকরণ। কর্মে বিশ্বাসী, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব-গুণসম্পন্ন এবং সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

যুবকদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনগঠনমূলক সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন। এই সিলেবাসের জন্য রচিত তাঁর প্রথম গ্রন্থটি হলো *সাবিলুল হুদা ওয়াল ইলম*। এই বইটিতে খুব সংক্ষেপে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনাগুলো নির্দিষ্ট উপদেশ আকারে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির দশটিরও অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে।

কীর্তি ও রচনা : সিরিয়ায় বিভিন্ন ক্লাসের ইসলামী শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে তিনি শাইখ আবদুল ফাত্তাহ (র.)-এর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আমাদের এই কিতাবটিও তাঁরা যৌথভাবে রচনা করেছিলেন। এটি রচনার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, নবীজীর ওপর অপবাদ আরোপকারী শত্রুদের কথাকে খণ্ডন করা।

সিলসিলাতুল আকাইদ নামে তিনি একটি আকিদা সিরিজ রচনা করেন। এটি ছোটো ছোটো নয় খণ্ডবিশিষ্ট। *সিলসিলাতুল ইবাদত* নামে অপর একটি সিরিজ রয়েছে । যুবসমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত *মিন হাদয়িল ইসলাম* নামেও রয়েছে অপর একটি সিরিজ। এই সিরিজের ছোটো ছোটো পনেরোটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

কাব্যপ্রতিভা : অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বরচিত অনেক কবিতা রয়েছে। অধিকাংশই হেজাজ ভূমির প্রতি অনুরাগ, বাইতুল্লাহ ও নবীপ্রেমের আলোয় উদ্ভাসিত।

মৃত্যু : ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯৫ হিজরির ১৭ই জিলহজ জুমার দিন দ্বিপ্রহরে ইন্তেকাল করেন। হালব শহরের মাকবারায়ে আরাবী-তে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। নবী, সিদ্দীকিন ও শহীদ, যাঁদের তিনি নেয়ামত দান করেছেন, তাঁদের সঙ্গে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা তাকে দান করুন।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি তাঁর রাসূলকে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সমস্ত ধর্মের ওপর তাঁর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে।

দুরুদ ও সালাম (পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি) বর্ষিত হোক খাতামুন নাবিয়্যিন সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের আদর্শ ও সঠিক পথের অনুসারীদের ওপর।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে সমগ্র বিশ্বজগৎ মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। সর্বদিক থেকে ভ্রষ্টতা পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির চরম অধঃপতন ঘটেছিল। তারা পাথর পূজায় নিমজ্জিত হয়েছিল। নিজ হাতে গড়া সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছিল।

তাদের অন্তরগুলো হয়ে পড়েছিল কঠিন ও নির্দয়। কন্যা সন্তানকে তারা জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো। সামান্য কুণ্ঠাবোধ করতো না।

জগদবাসীর তখন এমন হেদায়াত ও পথনির্দেশের ভীষণ প্রয়োজন ছিল, যা ভ্রষ্টতার সমস্ত শেকড় উপড়ে ফেলবে। মুমূর্ষু মানবতার মাঝে নবপ্রাণের সঞ্চার ঘটাবে।

মানবসমাজের তখন এমন জ্ঞান ও আলোর সুতীব্র প্রয়োজন ছিল, যা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সমস্ত অন্ধকার দূর করবে।

মানবতার এমন ঘোর সংকটকালে মহান রাব্বুল আলামিন জগদবাসীর ওপর অনুগ্রহ করলেন। অনাবিল রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরণ করলেন।

আরব ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কায় উদিত হলো মহান রেসালাতের প্রোজ্জ্বল রবি। হেরা পর্বতের গুহা থেকে বিচ্ছুরিত হলো উলূমে নবুয়তের হিরন্ময় দ্যুতি। মুহাম্মাদি নবুয়তের আবির্ভাব হলো কুরাইশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও কুলীন পরিবারে।

রেসালাতের সুমহান দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলেন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ পথে তিনি এমন ত্যাগ ও কুরবানির নজির পেশ করলেন, এমন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করলেন, যা সহনশীলতা, মাহাত্ম্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার মধ্য দিয়ে তাঁর নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্বকে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলে এবং রেসালাতের সত্যতাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করে।

এভাবে কালের চাকা ঘুরতে থাকে। একপর্যায়ে আসমান থেকে হিজরতের নির্দেশ আসে। তিনি জন্মভূমি পবিত্র মক্কার মায়া ত্যাগ করেন। তারপর হিজরত করে মদিনায় চলে যান। সেখান থেকে এই ঐশী নূর ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে। ইসলামের চিরন্তন বাণী পৌঁছে যায় সমুদ্র-মহাসমুদ্রেরও ওপারে। ইসলামের বদৌলতে মানুষের জীবনে আসে জ্ঞানপ্রাচুর্য। ইসলামের কল্যাণে মানবজাতি লাভ করে কল্যাণ-ঐশ্বর্য। ধরার বুকে নেমে আসে হেদায়াত নামক ফাল্গুনী সমীরণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিমল ছায়া।

যত বড় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আসমানী রেসালাতের দায়িত্ব পালন করা এবং এর পবিত্র ছোঁয়ায় অন্ধ চক্ষু, বদ্ধ হৃদয় ও বধির কর্ণগুলোকে খুলে দেওয়া; যদি না রেসালাতের প্রভু মহান রাব্বুল আলামিন তাকে সাহায্য করেন এবং নিজ মদদ ও নুসরত তাকে দান করেন।

তাই নবুয়ত ও রেসালাতের ধারক যিনি হবেন, তিনি শুধু মানব নন, মহামানব। স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর অন্তহীন সম্পর্ক। এমন মহামানবই সবচেয়ে উপযুক্ত যে, জগতের সর্বত্র তাঁর চর্চা হবে। মানুষ তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি গাইবে। তাঁর বর্ণিল জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করবে; যাতে তারা তাঁর উন্নত চরিত্র ও অনুপম আদর্শ থেকে এমন কিছু আহরণ করতে পারে, যার মাধ্যমে তারা সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করবে। তাঁর পবিত্র জীবনী ও মহান শিক্ষা থেকে এমন চির কল্যাণের সন্ধান লাভ করতে পারে, বহু শতাব্দী ধরে মানবজাতি যা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে। যে চির কল্যাণ তাদের ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তা, লাঞ্ছনার পরিবর্তে সম্মান দান করবে এবং দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে অনন্ত সৌভাগ্যের সন্ধান দিবে।

আমরা আমাদের উঠতি বয়সি সন্তানদের অনেককে দেখেছি, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান হতাশাজনক। একেবারে শূন্যের কোঠায়। তারা কেবল মানুষের মুখ থেকে কিছু সত্যবিকৃত বানোয়াট

কাহিনী শুনেছে এবং এমন কিছু গ্রন্থ পড়েছে যেগুলোতে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রকৃত ইতিহাসকে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেসবের গায়ে পবিত্র ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চরম অবমাননাকর পোশাক চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা সংক্ষিপ্তাকারে সীরাতের ওপর এই গ্রন্থটি রচনা করেছি; যাতে আগ্রহী পাঠকগণ স্বল্প সময়ে তা পড়ে নিতে পারে, যদিও নবীজীর পবিত্র সীরাত সম্পর্কে লেখা মানে হচ্ছে কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া।

এই গ্রন্থে আমরা আমাদের বক্তব্যগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থসমূহের সূত্রে উল্লেখ করেছি এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজনবোধে কিছু উদ্ধৃতির আমরা টিকা সংযোজন করে দিয়েছি। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলামানের জন্য প্রিয় নবীজী সম্পর্কে নিখাঁদ, নির্ভেজাল ও সত্য জ্ঞান লাভ করা আরও সহজ হবে। পাশাপাশি আমরা আমাদের প্রতিটি উদ্ধৃতির মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করি, এগুলো পাঠকের মনে আস্থা ও বিশ্বাস সঞ্চয় করবে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফিকদাতা।

হালব ॥ ৩০ জুমাদাল উখরা, ১৩৭০ হিজরি। **আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ**

আহমাদ ইজজুদ্দিন বায়ানূনী (র.)

জন্ম

নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ রীতি এই ছিল যে, তিনি তাঁদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে নির্বাচন করতেন। সবচেয়ে সম্মানিত ও অভিজাত পরিবার থেকে মনোনীত করতেন। মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর পূর্বপুরুষ সকলেই পূতপবিত্র ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। জাহেলিয়াত ও মূর্তিপূজার পঙ্কিলতামুক্ত ছিলেন। দাদি-নানিরাও সবাই ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্না, নিষ্কলুষ ও পবিত্রা।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরবদের মাঝে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, অভিজাত বংশ ও পরিবার থেকে নির্বাচন করেন। মনোনীত করেন পবিত্র ও নিষ্কলুষরূপে। তাই তিনি ছিলেন সর্বোত্তমদের সর্বোত্তম এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা।

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

ওয়াছিলা ইবনে আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে কিনানাহ গোত্রকে নির্বাচন করেছেন। কিনানাহ গোত্র থেকে কুরাইশ গোত্রকে নির্বাচন করেছেন। কুরাইশ গোত্র থেকে হাশিম উপগোত্রকে নির্বাচন করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।'[৬] (সুতরাং সর্বোত্তমদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, আমি তাঁদেরও সর্বোত্তম)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমুল ফিল' তথা আবরাহার হস্তিবাহিনীর কাবাঘর আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রোজ সোমবার।

---

[৬] সহীহ মুসলিম : ২২৭৬। সুনানে তিরমিযী : ৩৬০৫। একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাটি আছে, ' সুতরাং সর্বোত্তমদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, আমি তাঁদেরও সর্বোত্তম।'

কিন্তু জ্যোতির্বিদ আল্লামা মাহমুদ পাশার গবেষণা অনুসারে[৭] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ রোজ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ১২তারিখ নয়।

আল্লামা জাহেদ কাওছারী[৮] (র.) বলেন, 'এই মতটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম মতের সঙ্গে এই মতটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। এটি সূক্ষ্ম, সঠিক ও প্রকৃত গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে প্রদানকৃত। আর (সূত্র সঠিক হলে) গাণিতিক বিশ্লেষণ নির্ভুল হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষ ১২ই রবিউল আউয়ালের দিনটি গ্রহণ করেছে; যাতে নবীজীর জন্মগ্রহণের দিনটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমন দিনে হয়, যেদিন পৃথিবীতে তাঁর বিদ্যমান থাকার বিষয়টি সর্বসম্মত।'

ইমাম আহমাদ (র.) থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

> وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ،
>
> 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সোমবার নবুয়ত লাভ করেছিলেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে সোমবার বের হয়েছিলেন। সোমবার মদিনায় আগমন করেছিলেন এবং ইন্তেকালও করেছিলেন সোমবার।'[৯]

ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখুল ইসলামে[১০] বর্ণনা করেন, আবু কাতাদাহ আনসারী (রা.) বলেন, 'এক বেদুঈন আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি সোমবার দিন রোজা রাখার ব্যাপারে কী বলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি এবং সেদিনই আল্লাহ তাআলা আমার ওপর ওহি নাযিল করেন।'

---

[৭] তাঁর কৃত 'নাতাইযুল আফহাম ফি তাহকিকি মাওলিদিন নাবিয়্যি ও উমুরিহি আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম' নামক গ্রন্থে।

[৮] মৃত্যু ১৩৭১ হিজরি।

[৯] মুসনাদে আহমাদ : ২৭৭।

[১০] সহিহ মুসলিম : ২২।

জন্মগ্রহণের সময় প্রকাশিত মুজিযা

নবী-রাসূলদের আগমনের সুমহান ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমনের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন নবুয়তের প্রাসাদে গেঁথে দেওয়া সর্বশেষ ইট, খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবী। তাঁর আবির্ভাব ছিল সমগ্র বিশ্বের জন্য অনাবিল রহমতস্বরূপ। তাঁর আগমন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজাতির জন্য নূরের ফোয়ারাস্বরূপ।

জগৎশ্রেষ্ঠ এমন মহামানব, বিশ্বশ্রেষ্ঠ এমন শিক্ষক, মানবতার এমন কাণ্ডারীর শুভাগমনের দিন পৃথিবীর বুকে কুদরতের রাজডংকা বেজে উঠবে না, তা কী হয়? মহান রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবীজীর পদার্পণ উপলক্ষে তাঁর নূরের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন না, তা কী হয়?

মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীর বুকে শুভাগমনের দিন কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটাবেন এবং এগুলোর মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করবেন–এতে আশ্চর্যের কী আছে? এটাই তো স্বাভাবিক !

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের দিন অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল।

ক) ইবনে সাদ (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মাজান আমেনা বিনতে ওয়াহাব বলেন, আমি তাঁকে গর্ভধারণের পর থেকে প্রসব পর্যন্ত কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব করিনি। সে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে আমার ভেতর থেকে এমন একটি আলো বের হয়েছিল, যা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত করে ফেলেছিল।[১১]

খ) আবু নুআইম থেকে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবয়সী ছিলাম। আমার আম্মা শিফা বিনতে আমর আমাকে আল্লাহর রাসূলের মাতা আমেনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমেনা মুহাম্মাদকে প্রসব করার পর তাঁকে

[১১] তাবাকাত ১ : ৮৩।

আমার হাতে দেওয়া হলো। সে চিৎকার করে উঠলো। আর আমি একজনকে বলতে শুনলাম, তোমার রব তোমার প্রতি রহম করুন। শিফা বলেন, তখন আমার সামনে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল। এমনকি আমি সিরিয়ার কিছু প্রাসাদও দেখতে পেলাম।'[১২]

গ) খাসাইসুল কুবরা নামক গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, ইবনে সাদ আবু আজফা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় তাঁর ভেতর থেকে এমন এমন আলো বের হতে দেখলেন, যে আলোতে বুসরার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।'

এমন বিস্ময়কর কিংবা এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু যদি ঘটতো, তাতেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ, তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও এমন অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

'ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রাখতো। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।'[১৩]

জন্মগ্রহণের পর তাঁর মা তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; যাতে সে ফেরাউন ও তার চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা পায়।

...فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ.

---

[১২] দালাইলুন নাবুয়্যাহ ১ : ৪০।

[১৩] সূরা কাছাছ : ৪।

'...যখন তুমি তাঁর ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন তুমি তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। তুমি ভয় পেয়ো না; দুঃখ করো না। নিশ্চয় আমি তাঁকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাঁকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। তখন ফেরাউন পরিবার তাঁকে কুঁড়িয়ে পেল, পরিণামে যাতে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়।' [১৪]

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.

'আর ফেরাউনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হয়েছিল।'[১৫]

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণের ঘটনাও ছিল কুদরতের এক অপার বিস্ময়। তিনি পিতাবিহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমন হয়েছিল কুমারী মায়ের মাধ্যমে। সতিসাধ্বী, পূতপবিত্রা এক মা। আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে তাঁর মায়ের জন্য পাকা তাজা খেজুর পাতিত করেন এবং তাঁর পায়ের তলদেশ দিয়ে পানির ঝরনা প্রবাহিত করেন। দোলনায় থাকতেই ঈসা আলাইহিস সালাম বড়দের মতো কথা বলে উঠেন। তাঁর মায়ের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেন। সমাজের লোকের মিথ্যা অপবাদের সমুচিত জবাব দেন।

শাশ্বত কোরানে এসব অলৌকিক ঘটনাবলির বর্ণনা বড় নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে । চিরকাল মানুষ তা তেলাওয়াত করবে, কণ্ঠে কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা ছড়াবে এবং প্রজন্ম-পরম্পরায় কুদরতের কথা ঘোষণা করে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

[১৪] সূরা কাছাছ : ৭-৮।

[১৫] সূরা গাফির: ৩৭।

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ.

‘এ কিতাবে মারইয়ামের বৃত্তান্তও বর্ণনা করুন। সেই সময়ের বৃত্তান্ত, যখন সে তাঁর পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল। তারপর সে তাদের ও নিজের মাঝখানে একটি পর্দা ফেলে দিল। তখন আমি তাঁর কাছে আমার রূহ পাঠালাম, যে তাঁর সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো (তবে এখান থেকে সরে যাও)। ফেরেশতা বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। মারইয়াম বলল, আমার পুত্র কেমন করে হবে? আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আর আমি কোনো ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, আমার পক্ষে এটা একটা সাধারণ কাজ। আমি এটা করব এজন্য যে, তাঁকে মানুষের জন্য আমি এক নিদর্শন বানাব এবং আমার পক্ষ থেকে রহমতের প্রকাশ ঘটাব। এটা

সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। তারপর এই ঘটল যে, মারইয়াম সেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করল। (জন্মের সময় ঘনিয়ে এলে) সে তাঁকে নিয়ে দূরে এক নিভৃত স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসব বেদনা তাঁকে একটি খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। তখন ফেরেশতা তাঁর নিচে এক স্থান থেকে তাঁকে আহ্বান করে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের ডালাকে নাড়া দাও, তা থেকে পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। তারপর আহার করো ও পান করো এবং চোখ জুড়াও, মানুষের মধ্যে কাউকে আসতে দেখলে (ইশারায়) বলে দিও, আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি । সুতরাং আজ আমি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না। তারপর সে শিশুটি নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এলো। তারা বলে উঠল, হে মারইয়াম, তুমি তো বড় মারাত্মক কাজ করেছ! হে হারুনের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মা-ও ছিল না অসতী নারী। তখন মারইয়াম সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, সে দোলনার শিশু, আমরা তাঁর সঙ্গে কীভাবে কথা বলব? অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আর আমি যেখানেই থাকি-না-কেন আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যত দিন জীবিত থাকি আমাকে নামাজ ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন। আমাকে অহংকারী ও রূঢ় বানাননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি সালাম যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। এই হলো মারইয়াম পুত্র ঈসা। তাঁর সম্পর্কে এটাই সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা তর্ক-বিতর্ক করছে।'[১৬]

[১৬] সূরা মারইয়াম : ১৬-৩৪।

মুজিযা ও প্রকৃতির রীতি

দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মানুষের মনে কখনো কখনো ভ্রান্ত ধারণার জীবাণু অনুপ্রবেশ করে। তখন সে ধারণা করে, এ ধরনের মুজিযার বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টিজগৎ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতিবিরোধী। অথচ এসব নিয়ম ও রীতি আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন । তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাঁর একত্ব, বড়ত্ব, ক্ষমতা ও কুদরতের অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শনরূপে।

এসব দুর্বল বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে অভিনব ও সুনিপুণরূপে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা পরিচালনার জন্য এমন নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও অভিনবত্বের প্রমাণ বহন করে।

আর সৃষ্টিজগতের এই মহাব্যবস্থাপনা–বিশালতা ও ব্যাপ্তি সত্ত্বেও–সেই মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো স্বাভাবিকভাবে চলার একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যে সময় সম্পর্কে একমাত্র তিনিই অবগত।

সুতরাং তিনি যখন চান, তখন তাঁর কতিপয় নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে সৃষ্টিজগৎ তথা মহাবিশ্ব পরিচালনার স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতির সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। আর তখনই নবীদের ক্ষেত্রে মুজিযা ও ওলীদের ক্ষেত্রে কারামাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেও আল্লাহর কুদরতের কাছে তা নিতান্তই স্বাভাবিক।

...ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

'...এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।'[১৭]

এই আয়াতে 'অনুগ্রহ' বলে নবীদের সেসব মুজিযা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে আমাদের বর্ণনা করেছেন। কোরানের আয়াতসমূহের মাধ্যমে সেসব মুজিযার আলোচনা চিরন্তনতা লাভ করেছে।

---

[১৭] সূরা হাদীদ : ২১।

তন্মধ্যে একটি ঘটনা যা পবিত্র কোরান হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সম্পর্কে বর্ণনা করেছে,

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.

'তারা বলল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং এভাবে তোমরা তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য আরামদায়ক ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। আর আমি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করলাম।'[১৮]

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ.

'আমি ঝড়ো হাওয়াকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তাঁর হুকুমে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হতো, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। আর আমি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[১৯]

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একটি মুজিযার বর্ণনা পবিত্র কোরান আমাদের এভাবে বর্ণনা করেছে,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ.

'হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী? মূসা বলল, ওটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর করি, এর দ্বারা আঘাত করে আমার মেষপপালের জন্য (গাছ থেকে) পাতা ফেলি এবং এর মাধ্যমে

[১৮] সূরা আম্বিয়া : ৬৮-৭০।
[১৯] সূরা আম্বিয়া : ৮১।

আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়। তিনি বললেন, হে মূসা, ওটা নিচে ফেলে দাও। মূসা সেটি ফেলে দিল। অমনি সেটা ধাবমান সাপ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি ওটা ধরো, ভয় পেয়ো না। আমি এখনই ওটা আগের রূপে ফিরিয়ে দিচ্ছি।'[২০]

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

...وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

'...এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূল করে পাঠাবেন। (সে মানুষকে বলবে) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের সামনে কাদা দ্বারা এক পাখির আকৃতি তৈরি করব, তারপর তাতে ফুঁ দেব। তখন তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে এবং আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দেব, মৃতদের জীবিত করব এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খাও কিংবা মজুদ করো, তার সব তোমাদের জানিয়ে দেব। তোমরা ঈমান আনলে এসব বিষয়ে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) নিদর্শন রয়েছে।'[২১]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে অন্যান্য নবীর মুজিযার ঘটনাও বর্ণনা করেছেন সুস্পষ্টরূপে। যেমন : হযরত নূহ, ছালেহ, যুননুন, যাকারিয়া, দাউদ আলাইহিস সালাম।

শীঘ্রই আমরা নবীজীর কিছু মুজিযার আলোচনা তুলে ধরে পাঠকসমাজকে তাঁর প্রতি ঈমান ও মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করাবো।

---

[২০] সূরা ত্বহা : ১৭-২১।

[২১] সূরা আল ইমরান : ৪৯।

পূর্বোক্ত সূরা হাদীদের একুশ নং আয়াতে 'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ' বলে সেসব কারামাতও উদ্দেশ্য, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিপয় নেক বান্দাকে সম্মানিত করেছেন এবং পবিত্র কোরানে আমাদের যেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যেমন : আসহাবে কাহফ, মারইয়াম আলাইহিস সালামের রিজিকপ্রাপ্তি, সুলায়মান আলাইহিস সালামের সঙ্গীর নিকট কিতাবের ইলম থাকা এবং বন্ধ্যাত্বসত্ত্বেও যাকারিয়া আলাইহিস সালামের স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের ঘটনাবলি।

উপরোল্লিখিত আয়াত এবং এ সম্পর্কিত আরও অন্যান্য আয়াতে ঈমান ও ইয়াকীনের দৌলত লাভের, আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পদ অর্জনের যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। এগুলো মুজিযা ও কারামাত অস্বীকারকারীর মস্তিষ্কে আঘাত হানে। আঁধারচারীকে নিয়ে আসে আলোর রাজপথে। দাম্ভিকের দম্ভকে পদতলে পিষ্ট করে এবং অবিশ্বাসের ঝঞ্জালকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রবলস্রোতে।

দুগ্ধপান

আরবদের ঐতিহ্য ও রীতি ছিল, তারা তাদের শিশুসন্তানের জন্য পল্লী অঞ্চলে বসবাস করা ধাত্রী তালাশ করতো; যাতে সন্তানটি পল্লীর চিরসবুজ পরিবেশে সবুজ মন নিয়ে বেড়ে ওঠে। মহৎ, উদার, বিশুদ্ধভাষী, সুঠামদেহী ও সুস্বাস্থ্যবানরূপে গড়ে ওঠে। দেখা যায়, যারা শহুরে পরিবেশে বড় হয় তারা সাধারণত রুগ্ন, দুর্বল, বিষণ্ন ও হীন মনোবলের অধিকারী হয়ে থাকে। ইট-পাথরের মাঝে থেকে থেকে তাদের মনও ইট-পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

প্রিয় নবীজীর ক্ষেত্রে আরবদের এই ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়েছিল। তাঁর বেলাতেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তাঁকেও দুধমাতা হালিমার সঙ্গে মরুপল্লীতে পাঠানো হয়েছিল।

ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহুইয়া, আবু ইয়ালা, তাবারানী, বায়হাকী, আবু নুআইম, ইবনে আসাকির, যাহাবী, ইবনে কাছির, কাসতালানি ও সুয়ূতী (র.) জাফর বিন আবি তালিব (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজীর দুধমাতা হালিমা সাদিয়া (রা.) বলেন,

'কোনো এক চরম দুর্ভিক্ষের বছরে, যা আমাদের জন্য কিছু অবশিষ্ট রেখে যায়নি, দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে বনু সাদ ইবনে বকর গোত্রের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমি মক্কায় যাই। দুর্বল একটি গাধীতে চড়ে আমি মক্কায় পৌঁছি। আমার সঙ্গে ছিল আমারই একটি শিশু এবং একটি বৃদ্ধা উটনি। আল্লাহর শপথ! আমার উটনিটি এক ফোঁটা দুধও দিচ্ছিল না। আর এদিকে আমরা আমাদের শিশুটির ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নার কারণে একটি রাতেও এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। শিশুটিকে দেওয়ার মতো আমার বুকে না ছিল এক ফোঁটা দুধ, আর না উটনির ওলানে সামান্যতম দুধ। যা হোক, এভাবে আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের কাফেলার প্রত্যেক মহিলার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু এতিম বলে কেউ তাঁকে গ্রহণ করেনি। কারণ, শিশুর পিতার কাছ থেকে আমরা উত্তম অনুদান আশা করতাম। কিন্তু সে তো এতিম। এদিকে আমি ছাড়া আমার সঙ্গে আসা প্রত্যেক মহিলাই কোনো না দুধের শিশু পেয়ে গেল। মুহাম্মাদকে ছাড়া আর কোনো শিশুই পেয়ে আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ! কোনো শিশু সন্তান না নিয়ে এভাবে সঙ্গিনীদের মাঝে ফিরে যেতে আমার খারাপ লাগছে। অবশ্যই আমি সেই এতিম শিশুটির কাছে যাব এবং তাঁকে নিয়ে আসব। আমি গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।

আমি তাঁকে আমার হাওদায় নিয়ে এলাম। তখন আমার স্তনদ্বয় তাঁর চাহিদা অনুযায়ী দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে তৃপ্তি ভরে দুধ পান করল। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহও তৃপ্তি ভরে পান করল। আমার স্বামী গিয়ে লক্ষ করলেন, আমাদের উটনিটি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি চাহিদা মতো দুধ দোহন করলেন। আমরা দুজনে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলাম এবং একটি পরিতৃপ্ত রাত কাটালাম।

হালিমা বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামী আমাকে বললেন, শোনো হালিমা: আল্লাহর শপথ, তুমি এক বরকতপূর্ণ শিশু পেয়েছ। দেখলে না, ওকে আনার পর থেকে আমরা আজ রাতে কত কল্যাণ ও বরাকাহ লাভ করলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য এই কল্যাণ আরও বৃদ্ধি করতে থাকেন। হালিমা বলেন, তারপর আমরা আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আল্লাহর শপথ! আমার গাধীটি এত দ্রুত গতিতে ছুটে চলতে লাগল যে, কাফেলার সকল গাধাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল। একপর্যায়ে সফরসঙ্গীরা বলল, ব্যাপার কী আবু যুআইবের বেটি? এটি কি তোমার সেই গাধীটি নয় যাতে চড়ে তুমি যাত্রা শুরু করেছিলে? আমি তাদের বললাম, হাঁ। একথা শুনে তারা বলল, অবশ্যই তার মাঝে কোনো রহস্য রয়েছে।

এরপর আমরা আমাদের আবাসভূমি বনু সাদ অঞ্চলে চলে এলাম। তখন আল্লাহর জমিনে এই এলাকার চেয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত কোনো অঞ্চল ছিল বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের বকরীগুলো চরে-খেয়ে, তৃপ্ত ও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতো। আর আমরা দোহন করে তৃপ্তিসহ পান করতাম। অথচ অন্যরা দোহন করার মতো ওলানে এক ফোঁটা দুধও পেত না। তাদের বকরীগুলো সারা দিন চরে সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধার্ত পেটেই ফিরে আসত। একপর্যায়ে আমার প্রতিবেশীরা তাদের রাখালদের নির্দেশ দিতে লাগল, কি হলো তোমাদের, আবু যুআইবের বেটির রাখাল যেখানে মেষ চরায় তোমরা সেখানে মেষ চরাতে পারো না? তারপরও তাদের বকরীর পাল সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরত। এক ফোঁটা দুধ দিতে পারতো না। অথচ আমার বকরীগুলো আহারতৃপ্ত ও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসত।

আমরা উত্তরোত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। এভাবে দুবছর কেটে গেল। আমি তাকে দুধ ছাড়ালাম। সে এত দ্রুত বেড়ে উঠছিল যে অন্য শিশুদের এভাবে বাড়তে দেখা যায় না। দুবছর হতে না হতেই সে শক্ত-সামর্থ বালকে পরিণত হলো। হালিমা বলেন, এরপর আমরা তাঁকে তার মায়ের কাছে নিয়ে এলাম। অথচ আমরা তাঁকে আমাদের কাছে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে

সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম, তাঁর থেকে অনেক বরকত প্রত্যক্ষ করার কারণে। যা হোক, তাঁর মা তাঁকে দেখার পর আমি বললাম, আরও একটি বছরের জন্য যদি আপনার পুত্রকে আমাদের কাছে রাখার অনুমতি দিতেন! কারণ, তাঁর ব্যাপারে আমি মক্কার মহামারীর আশঙ্কা করছি। আমাদের পীড়াপীড়িতে তিনি শিশু মুহাম্মদকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে ফিরে এলাম।

পুনরায় নিয়ে আসার কয়েক মাস পর একদিন সে আমাদের বাড়ির পেছনে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহর সঙ্গে মেষপাল চরাতে গেল। হঠাৎ তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ছুটে এসে আমাকে ও তার পিতাকে বলল, আমার কোরায়শি ভাইকে শুভ্র পোশাকপরা দুজন লোক ধরে শুইয়ে ফেলেছে এবং তাঁর পেট চিরে কী যেন খোঁজাখুজি করছে। আমি এবং তার আব্বা ছুটে গেলাম। দেখি সে বিবর্ণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি হয়েছে বাবা? শিশু মুহাম্মাদ বলল, শুভ্র পোষাকপরা দুজন ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে চিৎ করে শোয়াল, তারপর আমার পেট চিরে কি যেন খোঁজাখুজি করল। হালিমা বলেন, আমরা তখন তাঁকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। তাঁর পিতা আমাকে বললেন, আমার মনে হয় শিশু মুহাম্মাদকে বদ জীন আছর করেছে। তুমি বরং আমরা যা আশঙ্কা করছি, এমন কিছু ঘটার আগেই তাঁকে তাঁর পরিবারে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। আমরা তাঁকে নিয়ে মা আমেনার কাছে চলে এলাম। তাঁর মা বললেন, আরে ধাই, এমন কী ঘটল যার কারণে তাঁকে নিয়ে আসতে হলো? কদিন আগেও তো ওকে তোমার কাছে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলে। আমরা বললাম, এখন তাঁর ব্যাপারে নানা আপদ-বিপদের আশঙ্কা করছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কিসের আশঙ্কা করছো? কী ঘটেছে সত্যি করে আমাকে খুলে বলো; পুরো বিষয়টি খুলে না বলা পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়লেন না।

মা আমেনা বললেন, তুমি আমার ছেলের ব্যাপারে জীন-ভূতের ভয় করছ? আল্লাহর কসম! শয়তানের সাধ্য নেই আমার ছেলের কোনো ক্ষতি করে। নিশ্চয় আমার ছেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তুমি তাঁকে রেখে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারো।'[২২]

---

[২২] ইমাম যাহাবী (র.) বলেন, এই হাদিসটির সনদ জাইয়্যিদ (উৎকৃষ্ট)। ইবনে কাসির (র.) বলেন, এই হাদিসটি আরও অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। জীবনচরিত এবং রাসূলের যুদ্ধবিদদের নিকট এটি হাদিসে মাশহুর হিসেবে গণ্য।

শৈশব

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম ছিলেন। কিন্তু তিনি মহান আল্লাহর পূর্ণ তত্ত্বাবধান লাভ করেছিলেন। মানব-আদর্শের পূর্ণরূপ ধারন করে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পবিত্র সত্তার মাঝে মানবিক সমস্ত গুণের সমাহার ঘটেছিল। সমাজের সর্বত্র তাঁর ঈর্ষণীয় খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারে সবাই তাঁকে অনেক মহান জ্ঞান করতো এবং অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতো। তারা সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) থেকে বর্ণিত,[২৩] ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'ভোর হলে আবু তালিব শিশুদের জন্য এক পাত্রে খাওয়ার আয়োজন করতেন। শিশুরা খেতে বসে কাড়াকাড়ি শুরু করতো। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাড়াকাড়িতে যোগ দিতেন না। তিনি হাত সরিয়ে নিতেন। দেখে চাচা আবু তালিব তাঁর জন্য আলাদা পাত্রের ব্যবস্থা করেন।'

জাদুল মাওলা আল্লামা মুহাম্মাদ (র.) বলেন,[২৪] 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে বেড়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার মতো প্রত্যক্ষ কোনো শিক্ষক ছিল না। কিংবা তার শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো অভিভাবক ছিল না। এসব তিনি শিখেছিলেন সুস্থ বোধ-বুদ্ধি, উন্নত ও মার্জিত অভিরুচি, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস এবং মানবিক গুণরাজির অধিকারী হওয়ার গুণে। অন্যান্য শিশুরা যেমন সমাজ ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, চারপাশের সবকিছু দেখে দেখে, শুনে শুনে শিখতে থাকে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমন ছিলেন না। তিনি সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন। অনন্য ছিলেন। তাঁর বেড়ে ওঠা অন্য শিশুদের মতো ছিল না। এমন হলে সমাজের লোকের দেখাদেখি তিনিও দেব-দেবীর উপাসনা করতেন। সেগুলোর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। মন্দিরের বেদিতে পূজোর ফুল চড়াতেন। মূর্তিপূজার গভীর পঙ্কিলতা ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার নিকষকালো অন্ধকারে ডুবে যেতেন। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠা ছিল ঐশী তত্ত্বাবধানে। জমিনের বুকে আসমানী নিকেতনে। তাই যাবতীয় উত্তম গুণাবলি ও বিশুদ্ধ স্বভাব-প্রকৃতি তিনি লাভ করেছিলেন সর্বোত্তমরূপে। কখনো কোনো মূর্তির সামনে মাথা নোয়াননি। স্বজাতির লোকদের সঙ্গে

---

[২৩] খাসায়েসুল কুবরা ১ : ৮২।

[২৪] তাঁর কৃত 'মুহাম্মাদ আল-মাছালুল কামিল' নামক গ্রন্থে।

কোনো পূজার উৎসবে অংশগ্রহণ করেননি। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত কোনো পশুর গোশত ভক্ষণ করেননি। আর এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ.

'আমার রব আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছেন।'[২৫]

যৌবন

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,[২৬] 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াতের যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ তাআলার কঠিন সুরক্ষা ও পূর্ণ তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। কারণ, তিনি তাঁকে রেসালাত ও মর্যাদা দান করতে চেয়েছিলেন। এভাবে নবীজী যখন যুবক বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তখন তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সর্বোত্তম চরিত্রবান, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, প্রতিবেশী হিসেবে সর্বোত্তম, সর্বাধিক সহনশীল, সত্যবাদী, আস্থাভাজন এবং অশ্লিলতা ও মন্দ স্বভাব-প্রকৃতি থেকে সবচেয়ে পূতপবিত্র ছিলেন। স্বজাতির

---

[২৫] 'কাশফুল খাফা' নামক গ্রন্থে আসকারী (র.) এই হাদিসটি সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনের হাজার (র.) হাদিসটিকে গরিব বলেছেন। তবে অর্থের দিক থেকে হাদিসটি সহীহ। ইবনুল আসির (র.) খুতবাতুন নিহায়াহ নামক গ্রন্থে এই বিষয়টি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেছেন।

ইবনে সামআনি (র.) ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে হাদিসটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আল-লাআলি' নামক গ্রন্থে বলেন, হাদিসের মর্মটি সহীহ। তবে কোনো বিশুদ্ধ সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়নি।

ইবনুল জাওযি (র.) 'আল-আহাদিসুল ওয়াহিয়া' নামক গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

কাশফুল খাফা নামক গ্রন্থে (১ : ৭২) ইসমাইল আজালুনী (র.) বলেন, আবুল ফযল বিন নাছের হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন এবং এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা হিসেবে গণ্য করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন মুবারকের অনেক ঘটনাবলির মাধ্যমেও হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কারণ, প্রিয় নবীজী/ প্রত্যেক কওমের সঙ্গে তাদের ভাষায় ও তাদের ঢংয়ে কথা বলতেন। (আব্দুল মাজিদ বায়ানূনী)

[২৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২ : ২৮৬।

লোকজন তাঁকে 'আল-আমিন' (পরম বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর মাঝে যাবতীয় সদগুণের সমাহার ঘটিয়েছিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে শৈশবে জাহিলিয়াতের সমস্ত কুসংস্কার ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখেন, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত ভাষ্যে বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي غِلْمَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مِمَّا تَلْعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى وَأَخَذَ إِزَارَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ إِذْ لَكَمَنِي لَاكِمٌ مَا أَرَاهُ ثُمَّ قَالَ : شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ قَالَ : فَشَدَدْتُهُ عَلَيَّ ثُمَّ جَعَلْتُ أَحْمِلُ وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي.

'একদিন আমি কুরায়শের কয়েকটি শিশুর সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। খেলার ছলে আমরা পাথর কুড়িয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিচ্ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে পরনের লুঙ্গি খুলে তা ঘাড়ে রেখে তার উপর পাথর বহন করছিলাম। আমি ওদের সঙ্গে একবার সামনে যাচ্ছিলাম আবার কখনো পেছনে পড়ছিলাম। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কে যেন আমাকে প্রচণ্ড একটি ঘুষি মেরে বললো, লুঙ্গিটা পরে নাও। সঙ্গে সঙ্গে আমি লুঙ্গিটি কাঁধ থেকে নিয়ে পরে নিলাম। তারপর পুনরায় খালি কাঁধে পাথর বহন করতে শুরু করলাম। তখন আমার সঙ্গীদের মাঝে একমাত্র আমিই ছিলাম লুঙ্গি পরিহিত।'[২৭]

ইবনে কাছির (র.) বলেন, 'এই ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত কাবা নির্মাণের সময়কার ঘটনার অনুরূপ। সে সময়ে তিনি ও তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) পাথর বহন করছিলেন।'

ইবনে কাছির (র.) যে ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাবের (রা.) বলেন,

لَمَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ

[২৭] ফাতহুল বারী ৭ : ১৪৬।

الحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

'কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণ করার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্বাস (রা.) (অন্যদের সাঙ্গে) পাথর বয়ে আনছিলেন। আব্বাস (রা.) তখন নবীজীকে বললেন, 'তোমার লুঙ্গিটি তোমার কাঁধের উপর রাখো, তা পাথরের ঘর্ষণ থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। লুঙ্গিটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দুটি তখন আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁর চেতনা ফিরে এলে তিনি তখন বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও, আমার লুঙ্গি দাও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেওয়া হলো'।'[২৮]

ইমাম বায়হাকী (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটি আছে, 'আমাকে উলঙ্গ হয়ে হাঁটতে নিষেধ করা হয়েছে।'

জাহেলী যুগের যাবতীয় মন্দ, নিকৃষ্ট ও গর্হিত কর্ম থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুরক্ষা দানের আরেকটি ঘটনা হাফেজ যাহাবী (র.) বর্ণনা করেন।[২৯] আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'জাহেলী যুগের লোকেরা যেসব কাজ করতো, দুবার ছাড়া কখনোই সেসব করার ইচ্ছা আমার মনে জাগেনি। আর সেই দুবারও আল্লাহ তাআলা আমাকে হেফাজত করেছেন। একদিন রাতে কুরাইশের এক যুবককে (যে মক্কার উপকণ্ঠে আমার সঙ্গে বকরী চরাত) আমি বললাম, তুমি আমার বকরীগুলোকে যদি দেখে রাখতে, তবে আমি মক্কায় গিয়ে অন্য যুবকদের মতো রাত্রিকালীন গল্পের আসরে অংশ নিতাম। রাখাল রাজি হলো। আমি মক্কার দিকে রওয়ানা দিলাম। প্রথম ঘরের কাছে গিয়ে গান বাজনা, দফ ও বাঁশি বাজানোর আওয়াজ পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী হচ্ছে? তখন তারা উত্তর দিল, অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ে হচ্ছে। আমি শোনার জন্য বসে পড়লাম। আল্লাহ তাআলা আমার কান বন্ধ করে দিলেন।

---

[২৮] সহীহ বুখারী : ৩৮২৯। সহীহ মুসলিম : ৩৪০।

[২৯] তারিখুল ইসলাম ১ : ৪৯। আল্লামা সূয়ুতী রচিত খাসায়েসুল কুবরা ১ : ৮৮।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রোদের আঁচ গায়ে লাগার পর আমার ঘুম ভাঙল। আমি তখন মক্কার উপকণ্ঠে আমার সেই সঙ্গীর কাছে ফিরে গেলাম। আরও একদিন একই রকমের কথা বলে রাখালের কাছ থেকে মক্কায় পৌঁছলাম এবং সেদিনও একই ঘটনা ঘটল। আল্লাহর শপথ! এরপর কখনো সে ধরনের মন্দ ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত হয়নি। এভাবে একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুয়ত দানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।'[৩০]

এসবই ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিবিড় তত্ত্বাবধান, সুসংহত সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা।

নবুয়তের আগের জীবনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমনই আরেকটি সুরক্ষা ছিল মূর্তির প্রতি তাঁর ঘৃণাবোধ। চাচার সঙ্গে নবীজীর সিরিয়া গমন ও পাদরি বুহায়রার সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনার বর্ণনায় বিখ্যাত সীরাত গবেষক ইবনে হিশাম (র.) বলেন,[৩১]

'পাদরি বুহায়রা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, হে বৎস, লাত-উজ্জার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি আমাকে তাঁর সঠিক উত্তর দেবে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লাত-উযযার দোহাই দিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আল্লাহর শপথ! ঐ দুটি দেবতাকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি।'

ইবনে হিশাম বলেন, 'পাদরি বুহায়রা তাঁকে লাত-উযযার দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। কারণ, সে তাঁর কওমের লোকদের এই দেবতা দুটির নামে শপথ করতে শুনেছিল।'

আল্লামা কাজি ইয়াজ (র.) বলেন,[৩২] 'বুহাইরা নবীজীকে লাত-উযযার দোহাই দিয়েছিল তাঁর নবুয়তের বিষয়টি পরীক্ষা কওে দেখার জন্য।'

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর দ্বারা একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মূর্তির প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘৃণা-বিদ্বেষ এ কারণে ছিল না যে, শৈশবে তাঁর মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তিনি অনাথ ছিলেন। মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার মতো তাঁর কোনো অভিভাবক ছিল না; তাই দেবদেবীর প্রতি তাঁর

---

[৩০] হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের সনদ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) এবং এর বর্ণনাকারীদের ছিকাহ (বিশ্বস্ত) বলেছেন।

[৩১] আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১ : ১৯৩।

[৩২] আশ-শিফা ২ : ১০৬।

মাঝে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। তাঁর শিশুমনের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক ও ভালোবাসা গড়ে উঠেনি। বরং মূর্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা-বিদ্বেষ মূলত আল্লাহর তাআলার সযত্ন তত্ত্বাবধান ও বিশেষ সুরক্ষার কারণে ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যক্তিত্বকে সমুন্নত করতে জাহেলিয়াতের সমস্ত পঙ্কিলতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছিলেন।

কিংবা এই ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগতিক কোনো কারণে ছিল না। যেমন, নিজেকে তিনি গরিব ও এতিম মনে করতেন। মন্দিরে গমনকারী সমবয়সী ধনীর সন্তানদের বিলাসী জীবনযাপন করতে এবং রেশমি পোশাক গায়ে গড়াগড়ি খেতে দেখতেন। এসব দেখে তিনি মনঃকষ্টে ভুগতেন। অন্তর্জ্বালায় পুড়তেন। ইত্যাদি কোনো কারণে ছিল না।

অথবা তা এ কারণেও ছিল না যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, মূর্তিগুলো মানুষের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। কাউকে কৃপা ধন্য করে, আর কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করে। কারণ, তিনি এসব মূর্তির উপাস্য হওয়ার বিষয়টিই বিশ্বাস করতেন না। উপাস্য হওয়া তো দূরের কথা, মূর্তিগুলো কারও রিজিক হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে, এই সামান্য ভ্রান্ত বিশ্বাসটুকুও তাঁর মাঝে ছিল না। ছিল না এগুলোর প্রতি বিন্দু পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আবেগ-অনুরাগ। ক্ষণিকের জন্যও তাঁর কখনো মনে হয়নি, এসব মূর্তি কারও কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে।

এসব কারণে তিনি মূর্তিগুলোকে ঘৃণা করতেন না; বরং মূর্তিগুলোর প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ ছিল, কওমের লোকদের তিনি নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণার শিকার এবং স্রষ্টাকে ভুলে প্রাণহীন নগন্য সৃষ্টির উপাসনা করতে দেখেছিলেন। তাদের তিনি দেখতেন বুঁদ হয়ে পাথর পূজা করছে, নিজ হাতে খোদাই করা প্রতিমার কাছে মঙ্গল কামনা করছে এবং অমঙ্গল থেকে বাঁচার আঁকুতি নিয়ে সেগুলোর পূজা-অর্চনায় ডুবে আছে।

নিজ সম্প্রদায় ও জাতির যাবতীয় গর্হিত ও শিরকী কর্ম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের এই বোধ ও চেতনা, এই মনোবল ও শক্তি আল্লাহ তাআলাই তাঁর মাঝে জাগ্রত করেছিলেন। নবুয়ত দানের অনেক আগেই স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তায় তাঁর অন্তর ব্যথিত এবং তাদের মুক্তি কামনায় তাঁর চিত্ত অস্থির করে তুলেছিলেন। এ যেন নবুয়তপূর্বে তাঁর মনমানস নবুয়তের জন্য তৈরি করে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে মনোনীত করতে এবং

রেসালাতের মহান দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে মূর্তিপূজার পাপ ও কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছিলেন।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

'আর আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূলদের বাছাই করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'[৩৩]

কাবা পুনর্নির্মাণের সময় হজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়ে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, রক্তাক্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকা সে দ্বন্দ্বের তিনি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান দিয়েছিলেন, যার ফলে চতুর্দিকে দ্রুত তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সবার মুখে মুখে শুধু তাঁর চর্চা হতে থাকে। মধ্যগগনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বরবি ঝলমল করতে থাকে।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর চিন্তার দূরদর্শিতা, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতার যথার্থ পরিচয় লাভ করি।

আমরা এখানে কাবা পুনর্নির্মাণের সেই ঘটনাটি বিখ্যাত সীরাত গবেষক ইবনে হিশামের ভাষায় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

ইবনে হিশাম বলেন,[৩৪] কুরাইশের সমস্ত গোত্র মিলে কাবা পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর সংগ্রহ করল। তারপর নির্মাণ কাজ সমাধা করে যখন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলো, তখন তা যথাস্থানে কে স্থাপন করবে তা নিয়ে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোত্রই হজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনের মহান মর্যাদা লাভ করতে চায়। প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের দাবিতে অনড়। এ নিয়ে গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে লাগল এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। বনু আবদুদ দার রক্ত ভর্তি একটি পেয়ালা নিল। তারা এবং বনু আদি ইবনে কাব ইবনে লূআই জোটবদ্ধ হয়ে রক্তের পেয়ালায় হাত ডুবিয়ে মৃত্যুর শপথ নিল। এ ব্যাপারে কুরাইশদের মাঝে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার-পাঁচ দিনব্যাপী চলল। তারপর তারা মসজিদে হেরেমে পরামর্শে বসল। তখন কুরাইশদের মাঝে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা বললেন, 'হে কুরাইশগণ, এই পবিত্র মসজিদের দরজা দিয়ে যে প্রথম প্রবেশ

---

[৩৩] সূরা হজ : ৭৫

[৩৪] আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১ : ২০৯।

করবে, তাকেই তোমরা এই বিবাদ-মীমাংসার দায়িত্ব দাও।' সবাই সন্তুষ্টচিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। তারপর দেখা গেল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই এক বাক্যে বলে উঠল,

'এ তো আমাদের 'আল-আমিন' (পরম বিশ্বস্ত), আমরা সকলেই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, এ তো মুহাম্মাদ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবদমান লোকদের কাছে উপনীত হলে সবাই তাঁকে তাদের বিবাদের বিষয়টি জানাল। তিনি বললেন, 'আমাকে একখানা কাপড় দাও।' কাপড় দেওয়া হলে তিনি তা বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ সেই কাপড়ের মাঝখানে স্থাপন করে বললেন, 'প্রত্যেক গোত্রের গোত্রপতি এই কাপড়ের এক পার্শ্ব উঁচু করে ধরুন। তখন তারা তা উঁচু করে ধরে নিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের স্থানে পৌছল। তারপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন এবং তার উপর গাঁথুনি দিলেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে তোমার সুস্পষ্ট অবগতি লাভ হলো যে, স্বজাতির লোকদের মাঝে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বস্ততা, দৃঢ় মত ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়ে সুখ্যাতি ছিল। তিনি তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মাঝে রক্তপাত বন্ধে ও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মক্কার কাফেরদের নিকট তিনি ছিলেন আস্থার বাতিঘর। সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। তাই তারা তাঁকে দেখে সমস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল, 'এ তো আমাদের 'আল-আমিন' (পরম বিশ্বস্ত), আমরা সকলেই এর ওপর সন্তুষ্ট'।

কুরাইশদের মাঝে নবীজীর বিশ্বস্ততার যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি ছিল তাঁর সততার খ্যাতি।

ইমাম বুখারী (র.) থেকে বর্ণিত,[৩৫] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে ঘোষণা করতে লাগলেন, হে বনু ফিহর, হে বনু আদী, অবশেষে তারা একত্রিত হলো। যে নিজে আসতে পারলো না, সে তার প্রতিনিধি পাঠালো; ব্যাপার কী দেখে আসার জন্য। সেখানে আবু লাহাব ও

[৩৫] সহীহ বুখারী : ৪৭৭০।

কুরাইশগণও আসলো। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ। আমরা আপনার থেকে কখনো কোনো মিথ্যা পাইনি। সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, তোমার ধ্বংস হোক, এজন্যই কী তুমি আমাদের একত্র করেছ? তারপর সে উঠে চলে গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়,

تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنى عَنْهُ مَالُه وَمَا كَسَبَ.

'আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি।'

সকল নবীই মেষপালক ছিলেন

মেষপাল চরানো ছিল সকল নবী-রাসূলের জন্য আল্লাহ তাআলার এক সুনির্ধারিত রীতি। তাঁদের সবাইকে দিয়ে তিনি মেষপাল চরিয়েছেন, নবুয়ত দানের আগেই তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন; যাতে ধীরে ধীরে তাঁরা রাখাল থেকে উম্মতের রক্ষক ও পরিচালক হয়ে উঠতে পারেন, পারেন শান্তি ও রহমতের দূত হয়ে উঠতে।

কারণ, মেষপাল যে চরায় তাকে অবশ্যই মেষপালের সঙ্গে থাকতে হয়, মিশতে হয়। আর মেষপালের সঙ্গে থাকা ও মেশার দ্বারা মানুষের মাঝে সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, হিতাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামনা, শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দানের গুণাবলি তৈরি হয়। চারিত্রিক ও মহৎ এসব গুণের কল্যাণেই ধীরে ধীরে একজন মানুষ তাঁর জাতি ও সম্প্রদায়ের আদর্শ রাহবার বা দিশারি হয়ে ওঠে। তাদের সকল দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে পারে।

নবীদের মেষপাল চরানো দারিদ্র কিংবা অভাবের তাড়নায় ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদের, মানবকাফেলার শ্রেষ্ঠ মানবদের দারিদ্র ও অভাবের হাতে বন্দী করে রাখার মতো নন; বরং এক বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে দিয়ে মেষপাল চরিয়েছেন; যাতে তাঁরা নবুয়ত ও রেসালাতের দাওয়াত দিতে গিয়ে যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মুখোমুখি হবেন, সেসব অম্লান বদনে মেনে নিতে পারেন। পাহাড়সম ধৈর্য নিয়ে মোকাবিলা করতে পারেন। উম্মতের সামনে নিজেদের ক্ষমা, উদারতা, দয়া, অনুগ্রহ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা স্থিরতা ও অবিচলতার মূর্তপ্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন।

বস্তুত এটি ছিল এমন এক নববী পাঠশালা, যেখানে নবীগণ মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা সমাধান এবং তাদের নেতৃত্বদানের পাঠ লাভ করেন।

বস্তুত এটি ছিল এমন এক ঐশী জ্ঞানগৃহ, যেখানে তারা ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতিকে চির সৌভাগ্য ও মুক্তির প্রাঙ্গনে এনে দাঁড় করাবার দীক্ষা লাভ করেন।

নবীদের মেষপাল চরানোর অভিনব এই রীতির কথা পবিত্র কোরানেও এসেছে। সূরা ত্বহায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ.

'তোমার ডান হাতে ওটা কী হে মূসা, তিনি বললেন, তা আমার লাঠি। আমি তাতে ভর দেই। আমার মেষপালকে তা দিয়ে পাতা পেরে খাওয়াই। এছাড়াও তাতে আমার আরও অন্যান্য প্রয়োজন রয়েছে।'[৩৬]

আবাদাহ বিন হাযেন (রা.) থেকে ইমাম বুখারী (র.)[৩৭] যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আবাদাহ বিন হাযেন (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মূসা আলাইহিস সালাম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তিনি মেষ চরাতেন। দাউদ আলাইহিস সালাম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও মেষ চরাতেন।'

যেহেতু মনমানস, স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণ গঠন এবং নবুয়ত ও রেসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য নবী-রাসূলদের যোগ্য করে গড়ে তোলার পেছনে মেষপাল চরানোর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে; তাই আল্লাহ তাআলা এই কাজটি সকল নবী-রাসূলের জন্য আবশ্যক করে দেন। তাঁদের সকলকে দিয়ে মেষপাল চরান। এক্ষেত্রে তাঁদের কেউ ব্যতিক্রম ও অবকাশপ্রাপ্ত ছিলেন না। এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নন।

বুখারী শরিফে[৩৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি মেষপাল চরাননি। সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও নন ইয়া রাসূলাল্লাহ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, আমিও। কারারীতে আমি মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম।

---

[৩৬] সূরা ত্বহা : ১৭-১৮।

[৩৭] আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮৫। ইমাম নাসায়ীসহ অন্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন।

[৩৮] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম নাসায়ী (র.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, 'আমি যখন নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি, তখন আমি আমার পরিবারের মেষ যিয়াদ উপত্যকায় চরাতাম।'[৩৯]

কারারীত–এটা কোনো স্থানের নাম হতে পারে কিংবা মুদ্রার নাম, যা আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারিশ্রমিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

মুদ্রার নাম হলেও দোষের কিছু নেই। কারণ, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকেও হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে মেষপাল চরানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো। এ কথা পবিত্র কোরানেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

'তিনি (শোয়াইব আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি আমার এই দুই মেয়ের এক মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে। তুমি দশ বছর পূর্ণ করলে সেটা হবে তোমার পক্ষ থেকে।'[৪০]

---

[৩৯] 'যিয়াদ' মক্কার নিম্নাঞ্চলবর্তী একটি স্থানের নাম। আর কারারীত যিয়াদের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। ইবরাহিম হারবী, হাফেজ ইবনে নাসির, ইবনুল জাওযী (র.) প্রমুখের অভিমত এটি। তারা বলেন, অনেকে কারারীত শব্দটিকে কীরাত শব্দের বহুবচন ভেবে ভুল করেন, যা দিরহাম দিনারের এককবিশেষ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেষপাল চরাতেন না। কারারীত বলে তিনি নির্দিষ্ট একটি স্থানের নাম বোঝাতেন। উভয় স্থান পাশাপাশি হওয়ার কারণে কখনো তিনি যিয়াদ, আবার কখনো কারারীত স্থানের নাম নিয়েছেন।'
সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা আইনী (র.) হাফেজ ইবরাহীম হারবী (র.)-এর এই মতটি সমর্থন করে বলেন, বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে এখানে মুদ্রার অর্থে ব্যবহৃত কারারীত শব্দটি উদ্দেশ্য নয়। আল্লামা আইনি (র.) কোনো কোনো আলেম থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'কারারীত শব্দটি কীরাতের বহুবচন। এটি রূপা থেকে তৈরি হয়ে থাকে। তখন এটি পারিশ্রমিক হিসেবে ব্যবহৃত হবে, কোনো স্থানের নাম হিসেবে নয়।'

[৪০] সুরা কাছাছ : ২৭।

আর সকল নবী মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী হতে উৎসাহিত করেছেন। চেষ্টা ও শ্রম ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অলস ও অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার নিন্দা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের নিরুৎসাহিত করেছেন।

***

অবশ্য মেষ লালন-পালন ছিল আরবদের সামাজিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। এটাকে তারা ক্রীতদাসদের কাজ মনে করতো না। সমাজের উচ্চ কিংবা মধ্যবিত্তের সন্তানদের প্রায় সকলকে কিশোর বয়সে তাদের পরিবার কিংবা অন্যের মেষ চরাতে হতো। জীবনের এই অধ্যায় তাদের পাঠ করতে হতো।

আবদুর রহমান ইবনে হাতেব (রা.) বলেন, 'আমরা আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের সঙ্গে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। যখন আমরা দাজনান উপত্যকায় পৌছলাম, তখন তিনি বললেন, আমি এই উপত্যকায় খাত্তাবের উট চরাতাম । আর তিনি কঠোর ও রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। যখন আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতেন, তখন আমাকে ক্লান্ত করে ফেলতেন। আর কাজে অবহেলা করলে প্রহার করতেন। সেখান থেকে আজ আমার এমন অবস্থান যে, মানুষ আমার দুপাশ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটে। আমার চেয়ে উঁচু মর্যাদার কেউ নেই। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে ভয় করি না।'[৪১]

নিজের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, তিনি তাঁর বাবা ছাড়া অন্যদেরও মেষ চরিয়েছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, 'একদিন তিনি 'আস-সালাতু জামিআহ' বলে ঘোষণা দিলেন। লোকেরা সমবেত হলো। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে বললেন, হে লোকসকল, আমি আমার বনি মাখযূমের খালাদের হয়ে মেষ চরাতাম। তাদের জন্য মিষ্টি পানি সংগ্রহ করতাম। তারা আমাকে এক মুঠ খেজুর কিংবা কিশমিশ দিতেন। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার এমনটি বলার উদ্দেশ্য কী? তিনি বলেন, আমি নিজেকে নিয়ে একা বসে ছিলাম। তখন আমার নফস (আমার ভেতর আত্মঅহমিকা সৃষ্টি করার জন্য) বলল, 'আপনি আমিরুল মুমিনীন। আপনার মাঝে এবং আল্লাহ

[৪১] তাবাকাত লি-ইবনি সাদ ৩ : ১৯১।

তাআলার মাঝে আর কেউ নেই। আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?' তাই আমি তার সামনে তার আসল পরিচয় তুলে ধরতে চাইলাম।'[৪২]

সুধী পাঠক, এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, আরবরা তাদের কথার মাঝে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মেষপাল চরানোর উল্লেখ এ কারণে করতো না, তারা এই কাজটিকে হীন, তুচ্ছ ও অপমানজনক মনে করতো। বরং তাদের কথায় এ বিষয়টির অতিমাত্রায় উল্লেখ ছিল দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক পরিবেশ ও পেশার প্রভাবের কারণে। দিনের অধিকাংশ সময় তারা মেষপাল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের কথাবার্তাতে এর উল্লেখ অনেক বেশি হতো।

আরবদের জীবনযাত্রা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে মেষপাল চরানোর প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, এটি তাদের ভাষাতেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তারা তাদের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে মেষপাল চরানোর জন্য ব্যবহৃত আরবি 'الرَّعْيُ' (চরানো) শব্দটিকে তার প্রকৃত অর্থে (অর্থাৎ গবাদিপশুকে আহার দান করা, ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো অর্থে) ব্যবহারের পাশাপাশি আরও অনেক অর্থে ব্যবহার করতো।[৪৩]

---

[৪২] তাবাকাতে লি-ইবনি সাদ ১ : ২১০। মুহিব তাবারী কৃত আর-রিয়াযুন নাদিরাহ ফি মানাকিবিস সাহাবাতিল আশারাহ ২ : ৫০।

[৪৩] আরবি অভিধান খুলে 'الرَّعْيُ' শব্দটির ক্ষেত্রে আরবদের ভাষাগত ব্যবহার-বৈচিত্রের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, মেষপাল চরানোর প্রভাব তাদের জীবনে কত গভীর ছিল! এটি তাদের মন-মগজ, চিন্তা-ভাবনা, স্বভাব ও রুচি , কথাবার্তা, সাহিত্য ও কাব্য রচনায় কতটা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল!

আসমানী কিতাবসমূহে সুসংবাদ

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময় ঘনিয়ে এলে ইহুদি পাদরি ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁর আলোচনা করতে থাকেন। কারণ, তাঁরা নবীজী ও তাঁর আগমনকাল বিষয়ে তাদের কিতাবে অনেক কথা পেয়েছিল এবং তাদের নবীগণও তাঁর বিষয়ে অনেক সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

‘যারা এই উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যাঁর কথা তারা তাদের নিকট তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পাবে, যে তাদের সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ হারাম করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সম্মান করবে এবং তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া নূরের অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।’[৪৪]

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ খিজির হোসাইন (র.) বলেন, ‘এই আয়াতে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবেও রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর প্রেরিত হওয়া, তাঁর দাওয়াত ও গুণ-বৈশিষ্ট্য-এসব কথা সেখানে রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই রয়েছে। কারণ, কোরানের উপরিউক্ত আয়াতটি ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অনেকেই তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু

[৪৪] সূরা আরাফ : ১৫৭। আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২ : ৩০৬।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল এবং তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত নবীজীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আলামতের কথা মানুষকে বলতো। আবার তাদের কেউ কেউ ছিল, যারা এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আলামতের কথা অস্বীকার না করলেও অহংকারবশত মানতে পারতো না। তারা বলত, এসব বর্ণনা দ্বারা মুহাম্মাদ নয়, অন্য কোনো নবী উদ্দেশ্য।

ঈমানের আলো বঞ্চিত এসব নীতিভ্রষ্ট ও জ্ঞানপাপী ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মপণ্ডিতদের সম্পর্কে পবিত্র কোরানে নাযিল হয়েছে,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

'আর আমি যাদের (আসমানী) কিতাব দান করেছি, তারা তাঁকে (এমন ভালোভাবে) চিনে, যেভাবে তারা তাদের সন্তানদের চিনে। আর তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।'[৪৫]

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ.

'আর স্মরণ করো; যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন, হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আমার হাতে থাকা পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহমাদ। অতঃপর তিনি যখন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এতো এক প্রকাশ্য যাদু।'[৪৬]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

---

[৪৫] সূরা বাকারা : ১৪৬।

[৪৬] সূরা ছফ : ০৬।

رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল । আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর, নিজেদের মাঝে পরস্পর দয়ার্দ্র। তুমি তাদের কখনো রুকু, কখনো সেজদারত অবস্থায় দেখবে। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করছে। সিজদার ফলে তাঁদের আলামত তাঁদের চেহারায় পরিস্ফুট। এই হলো তাদের সেসব গুণরাজি যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করলো। তারপর তাকে শক্ত করলো। তারপর তা পুষ্ট হলো এবং নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, কৃষক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তাঁদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'[৪৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

'এবং সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদের কিতাব ও হেকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করেন, যিনি

[৪৭] সূরা ফাতহ : ২৯।

তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করেন; তবে তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি এ কথা স্বীকার করছো এবং আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করছো? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।'[৪৮]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন। আর তিনি তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তাঁর উম্মতের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হলে তারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে।'[৪৯]

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, 'এখান থেকে আমরা একটি বিষয়ে অবগতি লাভ করতে পারি যে, সকল নবীকে রাসূলের আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁর অনুসরণের আদেশ প্রদান করা হয়েছিল।'[৫০]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মক্কাবাসীদের জন্য দোআ করতে গিয়ে বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

'হে আমার রব, আপনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনি মহপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।'[৫১]

---

[৪৮] সূরা আলে ইমরান : ৮১।

[৪৯] সহীহ বুখারী।

[৫০] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২ : ৩০৬।

[৫১] সূরা বাকারা : ১২৯

ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দোআ, ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা স্বপ্নের ফসল।'[৫২]

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)[৫৩] থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'ইহুদিরা খায়বারে গাতফান গোত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। তারা যখনই পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতো, ইহুদিরা পরাজিত হতো। তখন তারা এই দোআর আশ্রয় নিত, হে আল্লাহ! শেষ যামানায় আপনি যে নবী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা সেই উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদের তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন।' ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'এরপর যখন তারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতো, ইহুদিরা এই দোআ পড়তো এবং গাতফান গোত্রকে পরাজিত করতে সক্ষম হতো। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রেরিত হলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসল। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.

'তাদের নিকট যা আছে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সমর্থক কিতাব আসলো, যদিও পূর্বে তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করতো। তবুও তারা যা জানতো, তা তাদের নিকট এলে তারা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফেরদের প্রতি আল্লাহর লানত।'[৫৪]

ইমাম বুখারী (র.)[৫৫] আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি তাওরাত পড়তেন, আমি তখন বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে

---

[৫২] মুসনাদে আহমাদ ৪ : ১২৭। মুসতাদরাকে হাকেম ২ : ৬০০। বায়হাকী।

[৫৩] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২ : ৩০৮।

[৫৪] সূরা বাকারাহ : ৮৯।

[৫৫] সহীহ বুখারী, বেচা-কেনা অধ্যায় : ২২১৫, তাফসির অধ্যায় : ৪৮৩৮। মুসনাদে আহমাদ ২ : ১৭৪।

বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, অবশ্যই। আল্লাহর শপথ! কোরানে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলির বর্ণনা তাওরাত কিতাবেও রয়েছে। 'হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং উম্মী লোকদের মুক্তিদাতারূপে। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রেখেছি, যিনি মন্দ স্বভাবের ও কঠোরচিত্ত নন, বাজারে শোরগোলকারী নন এবং মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণকারী নন; বরং তিনি ক্ষমা করেন, মার্জনা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে বক্র জাতিকে সঠিক পথে না এনে তাঁকে মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ঘোষণা দেবে। আর এ কালেমার মাধ্যমে অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয় খুলে যাবে।

এমন সুস্পষ্ট, সত্য ও অকাট্য বক্তব্যসমূহের দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা ছিল, আর সমস্ত নবী স্বজাতির লোকদের তাঁর আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর রেসালাত ও রেসালাতের বিশ্বজনীনতা অস্বীকার করার কোনো পথ কারও জন্য খোলা নেই।

নবুয়তের পূর্বে

আমরা সবাই জানি, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। নবুয়তলাভের পূর্বে জীবনের এই সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর তিনি স্বজাতির লোকদের মাঝে কাটিয়েছিলেন। সমাজের লোকদের সঙ্গে ছিল তাঁর বসবাস, আহার-নিদ্রা, আবাস ও প্রবাস। সকলের মাঝে তিনি সততা-বিশ্বস্ততা, মেধা ও বুদ্ধির প্রখরতা, স্বভাবজাত পবিত্রতা, চারিত্রিক শুচিশুভ্রতা, কথার মাধুর্য ও জাদুময়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে সুপরিচিত ও সুবিদিত ছিলেন।

কিন্তু এই অনন্য, অনুপম ও অপূর্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাহার নবুয়ত ও রেসালাতের মতো মহান গুরুদায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ছিল না। কারণ, রেসালাত হলো, দিশেহারা মানবজাতিকে সরল ও সঠিক পথের দিশা দেওয়া, সত্য ও ন্যায়ের পথপ্রদর্শন করা।

রেসালাত হলো, হেদায়াতের আলাকবর্তিকা হাতে ভ্রষ্টতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধার করা, তাদের আলোকিত জীবন দান করা।

রেসালাত হলো, অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার মানুষকে অনন্ত সৌভাগ্যের সন্ধান দেওয়া, তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাধি থেকে মুক্ত করে ঈমান ও বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করা।

এ এমন এক গুরুদায়িত্ব, হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব, অসীম ধৈর্য ও আত্মিক ক্ষমতা এবং বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যা আঞ্জাম দিতে অক্ষম। এ দায়িত্ব কেবল সে-ই আঞ্জাম দিতে পারে, আল্লাহ যাকে কুদরতিভাবে মদদ ও নুসরত, সাহায্য ও সমর্থন করেন। একজন মানব মানবীয় সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রেসালাতের এ মহান আমানত বহনের যোগ্যতা কেবল তখন অর্জন করতে পারে, যখন তাঁর সঙ্গে বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং সুস্পষ্ট আসমানী সুসংবাদ সে লাভ করে।

এসব অলৌকিক ঘটনাবলি ও আসমানী সুসংবাদসমূহ তাঁর মনোবলকে দৃঢ় করে, চিত্তকে স্থির করে এবং রেসালাতের যাবতীয় দায়িত্ব পালন তাঁর জন্য সহজ করে তোলে। নিজের নবুয়ত লাভের ব্যাপাওে সে নিজেই তখন সবচেয়ে আস্থাশীল এবং বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, সন্দেহ-সংশয়ের কোনো ঘাত যে আস্থার প্রাচীর চূর্ণ করতে পারে না। অবিশ্বাসের প্রলয়ংকারী কোনো ঝড় যে বিশ্বাসকে

উপড়ে ফেলতে পারে না। নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে সে তখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে,

وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ، أَوْ أَهْلِكَ فِيه مَا تَرَكْتُه.

'আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে রেখে দেয়, এই শর্তে যে, আমি এই শাশ্বত সত্যের দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেব। তবু আমি এক মুহূর্তের জন্য এ কাজ ছাড়ব না, যতক্ষণ না আল্লাহ এই দীনকে জয়ী করেন কিংবা এ পথেই আমার জীবন চলে যায়।'[৫৬]

নবুয়ত লাভের আগেও নবুয়তের সুসংবাদস্বরূপ প্রিয় নবীজীর সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এমনই একটি ঘটনা আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট ওহি আসলো।'[৫৭]

জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি মক্কায় একটি পাথরকে চিনতাম, যা আমার নবুয়ত লাভের আগে আমাকে সালাম করতো। পাথরটিকে আমি এখনও চিনি।'[৫৮]

এসব অলৌকিক এবং এ জাতীয় আরও অনেক ঘটনাবলি, যা সামনে আমরা বর্ণনা করব-এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন এবং তাঁকে রেসালাতের মতো গুরুদায়িত্ব বহনে যোগ্য করে তুলেছিলেন। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.

'নিশ্চয় আমি আপনার ওপর গুরুভার 'কালাম' নাযিল করব।'[৫৯]

---

[৫৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ২ : ৪৩।

[৫৭] সহীহ বুখারী : ৪৬।

[৫৮] সহীহ মুসলিম : ৩৬।

[৫৯] সূরা মুযযাম্মিল : ৫।

নবুয়ত লাভ

এভাবে একের পর এক সুসংবাদ প্রকাশ পাচ্ছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের নেয়ামত দান করে সম্মানিত করলেন। হেরাগুহায় অবস্থানকালে তাঁর ওপর ওহি নাযিল হলো। সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের নবুয়ত লাভের মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির শুভ উদ্বোধন হলো। নবীজীর তখন বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। ওহির প্রথম আয়াতগুলো ছিল,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

> ‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু, যিনি কলমের মাধ্যমে শিখিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে অজ্ঞ ছিল।’[৬০]

এই আয়াতগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর বুক তখন ধুকধুক করছিল। দ্রুত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর আবৃত করে দাও। আমাকে চাদর আবৃত করে দাও।’

তখন আম্মাজান খাদিজা (রা.) নবীজীকে গায়ে চাদর জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভয় কেটে গেল। তিনি খাদিজা (রা.)-কে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। তারপর বললেন, ‘নিজের জীবনের ব্যাপারে আমি শঙ্কাবোধ করছি।’ খাদিজা (রা.) তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর কসম! কখনো নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করেন। অসহায়-দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন। মেহমানদারি করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন।’

তারপর খাদিজা (রা.) তাঁকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হিব্রুভাষায় লিখতে জানতেন। আল্লাহ তাআলা যতটুকু তাওফিক দিতেন, হিব্রুভাষায় তিনি ইঞ্জিল কিতাব

---

[৬০] সূরা আলাক : ১-৫।

লিখতেন। খাদিজা (রা.) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাত ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।'

তখন ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী দেখ ভাতিজা?'

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা দেখেছেন সব খুলে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, 'ইনি সেই বার্তাবাহক, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন, হায় আফসোস! যদি আমি সেসময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কি আমায় বের করে দেবে?'

তিনি বললেন, 'হাঁ। তুমি যে বার্তা ও বাণী নিয়ে এসেছ তা যেই নিয়ে এসেছে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে। যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে আমি খুব জোরালোভাবে তোমাকে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন।[৬১]

তারপর কিছুদিনের জন্য ওহির আগমন বন্ধ থেকে আবার শাশ্বত দীনের প্রতিষ্ঠা এবং তার বিধিবিধান বর্ণনার লক্ষ্যে ধারাবহিকভাবে ওহি নাযিল হতে থাকে।

[৬১] বুখারী ২ : ৪৬। মুসলিম ২ : ১৯৭।

মানবকুলের কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা

ইসলামের কতিপয় শত্রুদের দাবি, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদি পাদরি এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতেন এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এটি একটি নির্জলা মিথ্যাচার এবং জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এর অসারতা প্রমাণে অকাট্য একটি কথাই যথেষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি উম্মী ছিলেন। তাঁর পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজের সকলেই তা অবগত ছিলো।

আল্লামা কাজি ইয়াজ (র.) বলেন,[৬২] 'স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ইরশাদ করেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। লেখাপড়া জানা কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শও তিনি লাভ করেননি। এমন কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। তদুপরি তাঁর বেড়ে ওঠা ছিল এমন সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে, লেখাপড়া সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।'

পবিত্র কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টির অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.

'আপনি তো ইতোপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহপোষণ করবে; বরং এ কোরান এমন নিদর্শনাবলির সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। আর কেবল জালেমগণই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।'[৬৩]

---

[৬২] আশ-শিফা ১ : ২৯৯।

[৬৩] সূরা আনকাবূত : ৪৮-৪৯।

আরবদের জ্ঞানের দৌড় ছিল বংশবিদ্যা, কাব্য ও ভাষার অলংকারশাস্ত্র পর্যন্ত। এই জ্ঞানটুকুও তারা আহরণ করতো বংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে, অনেক কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐশী জ্ঞানসাগরের বিপুলতার সামনে তাদের এই জ্ঞান ছিল সামান্য এক ফোঁটা পানিসম। কোনো ঘোর নাস্তিকও সেটা অস্বীকার করতে পারবে না। মক্কার কাফেররাও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আমাদের এ দাবির খণ্ডন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারা অহংকারবশত বলেছিল, 'এসব পূর্বপুরুষদের কল্পকাহিনী । একজন মানুষ তাঁকে এসব শেখান।'

তখন তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত দাবির খণ্ডনে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ.

'আপনি বলে দিন, এ কোরান তো রুহুল কুদস (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিল করেছে, যাতে তা ঈমানদারদের অবিচল রাখে এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদের কারণ হয়। হে নবী, আমার জানা আছে যে, তারা বলে, তাঁকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। অথচ তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে সে অনারব। আর এটা স্পষ্ট আরবি ভাষা।'[৬৪]

তারা মূলত অহংকারবশত কোরান সম্পর্কে এসব জঘন্য মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো। যেমন, তাদের একটি মিথ্যা অপবাদ ছিল, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারসি (রা.) কিংবা রোমান ক্রীতদাসের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেন।'

অথচ সালমান ফারসি (রা.)-এর সঙ্গে নবীজীর পরিচয়ই ঘটেছিল হিজরতের পর । ততদিনে পবিত্র কোরানের বৃহৎ একটি অংশ নাযিল হয়ে গিয়েছিল। শুধু কি তাই, নবুয়তের বহু নিদর্শন ও মুজিযাও প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। এত পরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে রাসূলে হাবিবের পরিচয় হয়েছিল। আর রোমান ক্রীতদাসটি

[৬৪] সূরা নাহল : ১০৩, ১০৪।

তো ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কাছেই কোরান শিখত।

সালমান ফারসি এবং রোমান ক্রীতদাস-তাঁরা দুজনেই অনারব ছিলেন। তাদের কারও ভাষা আরবি ছিল না। অথচ মক্কার কাফেররা ছিল বাগ্মী, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবিভাষী । তাদের পক্ষেও কোরানের অলংকারপূর্ণ সৌন্দর্যের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। কোরানের ছোটো একটি আয়াতের মোকাবেলায় কিছু পেশ করতে তারা অক্ষম ছিল। এমনকি কোরানের অপূর্ব বিন্যাস কাঠামো, নিখুঁত শব্দের গাঁথুনী ও অনুপম রচনাশৈলী–সবই এত উঁচু স্তরের ছিল যে, সেগুলো তারা বুঝতেও অক্ষম ছিল। এসব তাদের জ্ঞান ও বোধসীমার বাইরে ছিল। স্বয়ং আরবদের যখন এই অবস্থা ছিল, তখন একজন অনারবের পক্ষে কোরানের অনুরূপ আয়াত বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী করে শেখানো সম্ভব?

তা ছাড়া সালমান ফারসি (রা.) কিংবা রোমান ক্রীতদাসটি তো সেই সমাজেই বসবাস করতো। তাদের সঙ্গে সমাজের কাফেরদের উঠাবসা ও কথাবার্তা হতো। কিন্তু আমরা ইতিহাসের বিশাল গ্রন্থসম্ভার চষে তাদের এমন কোনো কথা বা উক্তি খুঁজে পাইনি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কোরানের অনুরূপ।

তদুপরি কাফের-মুশরিকরা অর্থ ও জনবলে বলিয়ান ছিল। তাদের কোনোকিছুর কমতি ছিল না। তাহলে কীসের বাধা ছিল? তারা তো চাইলে এদের মুখ দিয়ে এমন কিছু বলিয়ে নিতে পারতো, যার মাধ্যমে রাসূলে হাবিবের বিরোধিতা করা যায়, তাঁর ওপর অবতীর্ণ কোরানের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করা যায়, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা যায়।

আরেকটি বিষয় হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আপন গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে থাকতেন। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এলাকায় তাঁর যাতায়াত এত কম ছিল যে, কিছুতেই এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না, তিনি তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সমস্ত পাতা উল্টে আমরা জানতে পারি, প্রিয় নবীজী মাত্র একবার কি দুবার সেসব এলাকায় সফর করেছিলেন। তাও ছিল খুব সংক্ষিপ্ত সফর। এত সংক্ষিপ্ত সময়ে সামান্য দুয়েকটি বিষয় হয়তো শেখা যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের যে মহাসমুদ্র, তা আহরণ করা

অসম্ভব।

তা ছাড়া সংক্ষিপ্ত সেই দুয়েকটি সফর কোনো একাকী সফর ছিল না। মক্কার বণিক কাফেলার লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিল। আর বণিক কাফেলার লোকেরা তাঁর অপরিচিত কেউ ছিল না। তারা সবাই তাঁর জাতি ও গোষ্ঠীর এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন ছিল। সুতরাং সফরকালীন তাঁর কোনো কিছুই তাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল না।

পবিত্র কোরান বারবার এই ভ্রান্ত দাবির অসারতা তুলে ধরেছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

'কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা সে লেখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সামনে পড়ে শোনানো হয় । বলুন, এই বাণী তো অবতীর্ণ করেছেন সেই সত্তা, যিনি নবোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, চির দয়াময়।'[৬৫]

[৬৫] সূরা ফুরকান : ৪-৬।

তিনি কেবলই একজন রাসূল কোনো নেতা নন

বর্তমানে মুসলমানরা একটি মারাত্মক ফেতনার সম্মুখীন হয়েছে। তথাকথিত কিছু লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য ও লেখালেখির বাজারে যারা অচল মুদ্রায় পরিণত হয়েছে, বাজার চাঙ্গা করার জন্য ধর্মের গা ঘেঁষছে। মানুষের ধর্মানুভূতিকে পুজি করে 'কলম ব্যবসায়' অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলাম, ইসলামের নবী এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করছে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং নবীগণের আনীত দীনের প্রতি মুসলমানদের অন্তরে যে স্থির দৃঢ় নির্মল বিশ্বাস রয়েছে, সেই বিশ্বাসকে খুব সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

এদের আমরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম শ্রেণি : যারা ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে সরাসরি আক্রমণ করছে। তাদের এ আক্রমণের উদ্দেশ্য, ইসলামের পবিত্র দীন ও শরীয়তের প্রতি তাদের অন্তরে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ জমে আছে তা উদগীরণ করা। ইসলামের সৌন্দর্য নিয়ে তাদের অন্তর্জ্বালা প্রশমিত করা । ধীরে ধীরে মুসলিম সন্তানদের অন্তরে ইসলামী শরীয়তের পবিত্রতার যে প্রদীপশিখা জ্বলে আছে, তা ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে ফেলা এবং তাদের বিশ্বাসের ভীতকে ধসিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণি : যারা কপট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নেক সুরতে ধোকা দিচ্ছে। দীনের মহাপণ্ডিত সেজে সুকৌশলে দীন ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। রক্ষণের নামে হরণ করছে। এ ক্ষেত্রে তাদের টার্গেট সেসব মুসলিম যুবক, ইসলামী শরীয়তের উৎস ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যাদের মাঝে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা নেই। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের তেমন পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তবে তারা ইসলামকে জানতে চায়। ইসলামী শরীয়তকে বুঝতে চায়। এ বিষয়ে তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ রয়েছে।

এই শ্রেণির লেখকরা সরলমনা এসব যুবকদের সেই আগ্রহ ও আকর্ষণকে ব্যবহার করে সুচতুরতার সঙ্গে লেখার মাঝে এমন বিষাক্ত বীজ ছড়িয়ে রাখছে, যা ইসলামের শুভ্র নির্মল আকীদা-বিশ্বাস ও স্বচ্ছ পবিত্র শরীয়ত সম্পর্কে তাদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করে। সরলমনা পাঠক তা বুঝতে পারে না। তার কাছে মনে হয়, লেখক তো আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গেই প্রকৃত বিষয় তুলে ধরেছে।

বিশ্বাসের মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত এসব নাস্তিক্যমনা জ্ঞানপাপীদের সম্পর্কে

শাইখ মুস্তফা ছাবরী (র.) তাঁর *আল-ক্বাওলুল ফাসল* নামক গ্রন্থে যা বলেছেন, তা সংক্ষিপ্তাকারে আমরা এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

'এসব বিপথগামী লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই, এরা সরাসরি মুজিজাকে অস্বীকার করে। মুজিজার বাস্তবতাকে এরা অসম্ভব মনে করে, নবুয়তের পরিবর্তে 'আবকারিয়্যাত' (প্রতিভা)-এর বিষয়টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়টি সামনে নিয়ে আসার জন্য লেখালেখি করে।

এ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, গবেষণা করে তারা যে 'আবকারিয়্যাত'-এর সন্ধান পেয়েছে, এর উৎপত্তি মূলত নবুয়তের প্রতি তাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস না থাকার কারণে। 'আবকারিয়্যাত' (প্রতিভা)-এর বিষয়ে তাদের বিশ্বাস যতটা দৃঢ়, নবুয়ত ও রেসালাত বিষয়ে ততটা নয়। অন্যথায় তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহকে নবুয়তের দলিলের পরিবর্তে তাঁর মহাপ্রতিভার সাক্ষর বলার অপপ্রয়াস চালাবে কেন? এর মানে 'আবকারিয়্যাত' (প্রতিভা)-এর বিষয়টিকে তারা নবুয়তের চেয়ে মহান, শ্রেষ্ঠ, নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত বলে মনে করে।

প্রায়ই তারা নবুয়ত ও প্রতিভার মাঝে তুলনা করতে গিয়ে নবুয়তের অন্যতম স্পষ্ট নিদর্শন মুজিযাকে প্রতিভা বলে দাবি করে। অর্থাৎ তারা বলতে চায়, মুজিযা কোনো গায়েবী বা আসমানী বিষয় নয়; বরং অতিমানবীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী একজন ব্যক্তির প্রতিভার জাগতিক সাক্ষর। এটা তাদের নবুয়তের মতো মহান বিষয়কে অবহেলা এবং তার পরিবর্তে 'আবকারিয়্যাত' (প্রতিভা) শব্দের প্রচলন ঘটানোর ঘৃণ্য অপপ্রয়াসের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তারপর তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক লেখায় তারা 'নবুয়ত' শব্দের পরিবর্তে 'নবীজীর নেতৃত্ব', 'নবীজীর বীরত্ব'–এ জাতীয় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য, মুজিযার মতো গায়েবী বা আসমানী বিষয়সমূহ মানুষের মনমস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা। নবুয়তের প্রতি তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে ধ্বংস কওে দেওয়া। এর পরিবর্তে রাসূলের 'অতিমানব' কিংবা 'মহাপ্রতিভাধর' হওয়ার বিষয়টি তাদের ধ্যানধারণায় সেঁটে দেওয়া। এমনই একটি অপচেষ্টা আমরা *আল আবতাল* নামক গ্রন্থের পাশ্চাত্যবিদ লেখকের লেখার মাঝে দেখতে পাই। তিনি সেখানে এভাবে উল্লেখ করেছেন مُحَمَّدٌ الْبَطَلُ فِي صُوْرَةِ النَّبِيِّ (নবীরূপে বীর মুহাম্মাদ)।

শাইখ মুস্তফা ছাবরী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, যারাই

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক লেখায় তাঁকে 'মহান নেতা', 'প্রতিভাধর', 'মহাপণ্ডিত', কিংবা 'মহামনীষী' এসব বিশেষণ যুক্ত করে শিরোনাম করে, তারা হয়তো অজ্ঞাতসারে কিংবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভুলটি করে। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য, মানুষের মনমস্তিষ্ক থেকে প্রিয় নবীজীর মহান রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে নবুয়ত ও রেসালাতপ্রাপ্তির বিষয়টি সুকৌশলে মুছে ফেলা এবং নবীজীর সঙ্গে যে সম্পর্কের সূত্র ধরে আমাদের মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সম্পর্কের সূত্রতা ছিন্ন করে দেওয়া।

মানব-ইতিহাসে কত মহান নেতার আগমন ঘটেছে!

আগমন ঘটেছে কত অসামান্য প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারীর! কত রথী মহারথীর!

কিন্তু তাদের কারও পক্ষে কি সম্ভব হয়েছে কোনো কিছুর বলে নবুয়ত লাভ করা? কিংবা কখনো কি সম্ভব হবে?

হিরাক্লিয়াসের স্বীকৃতি

মক্কার কাফেরদের সরদার আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মহাসম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিম্নোক্ত কথোপকথনটি শুনুন। এখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং তাঁর বাদশাহ কিংবা নেতা হওয়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.) তাঁকে বলেছেন, 'এটা সেই সময়ের কথা যখন আমার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সঙ্গে আমাদের সন্ধি চুক্তি ছিল। তিনি বলেন, আমি তখন সিরিয়ায় ছিলাম। রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চিঠি এলো। চিঠিটি দেহয়া কালবী (রা.) নিয়ে এসেছিল। তিনি সেটি বছরার গভর্নরের কাছে দিলেন। গভর্নর দিলেন সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে। তখন তিনি বললেন,

যে লোকটি নবী দাবি করে, তাঁর গোত্রভুক্ত কেউ কি এখানে আছে?

তারা বলল, হাঁ।

আবু সুফিয়ান বলেন, কুরাইশের একটি দলের সঙ্গে তখন আমাকে ডাকা হলো। আমি হেরাক্লিয়াসের দরবারে এলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। বললেন,

তোমাদের কে নিজেকে নবী দাবি করা ব্যক্তির সবচে নিকটাত্মীয়?

তখন আমি বললাম, আমি।

তখন তারা আমাকে তাঁর সামনে নিয়ে বসালো। আর আমার সঙ্গীদের আমার পেছনে। তারপর তিনি দোভাষীকে ডেকে বললেন,

তুমি তাদের বলে দাও, এ লোকটিকে আমি নবুয়তের দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। সে আমার সঙ্গে মিথ্যা বললে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করবে।

আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহর শপথ! যদি আমার ওপর মিথ্যার দুর্নাম আরোপের ভয় না থাকত। তাহলে আমি অবশ্যই মিথ্যা বলতাম।

তারপর হিরাক্লিয়াস তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো; তোমাদের মাঝে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?

আমি বললাম, তিনি আমাদের মাঝে উচ্চ বংশমর্যাদার অধিকারী।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন?

আমি : না।

হিরাক্লিয়াস : নবুয়তের দাবি করার আগে তোমরা কখনো কি তাঁকে মিথ্যা বলার কারণে অভিযুক্ত করেছো?

আমি বললাম, না।

হিরাক্লিয়াস : সমাজের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত লোকেরা তাঁর আনুগত্য করে নাকি দুর্বলেরা?

আমি : বরং সমাজের দুর্বল লোকেরা।

হিরাক্লিয়াস : তাঁদের সংখ্যা কি বাড়ছে না কমছে?

আমি : বাড়ছে।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর এই দীন গ্রহণ করার পর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের কেউ কি ধর্মান্তরিত হয়েছে?

আমি : না।

হিরাক্লিয়াস : তোমরা কি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ?

আমি : হাঁ।

হিরাক্লিয়াস: তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কেমন?

আমি : আমাদের মাঝে এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের ফলাফল কূপের বালতির মতো। কখনো তিনি আমাদের পরাজিত করেন। আবার কখনো আমরা তাঁকে পরাজিত করি।

হিরাক্লিয়াস : তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?

আমি : না। তবে বর্তমানে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ আছি। আমারা জানি না, এ ব্যাপারে তিনি কী করবেন। আল্লাহর শপথ! এই একটি কথা ব্যতীত নিজে থেকে কোনো কথা সংযোজন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর আগে আর কেউ কি এমন কথা বলেছে?

আমি : না।

তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তুমি তাকে বল, আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তাঁর কওমের সম্ভ্রান্ত বংশের মাঝেই পাঠানো হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মাঝে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না? তখন তুমি বলেছ, না।

তাই আমি বলছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মাঝে কেউ বাদশাহ থাকলে আমি বলতাম, ইনি এমন ব্যক্তি যে তাঁর পূর্বপুরুষের বাদশাহি ফিরে পেতে চায়।

আমি তোমাকে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা কি দুর্বল লোক না সম্ভ্রান্ত লোক?

তখন তুমি বলেছ, না; বরং দুর্বল লোক।

(হিরাক্লিয়াস :) বাস্তবে এই শ্রেণির লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইতোপূর্বে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যা বলার

অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ কি না?

তুমি বলেছ, না। এতে বুঝতে পারলাম, মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা বলেন না, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন এমনটি অসম্ভব।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ তাঁর আনীত ধর্মে প্রবেশ করে আবার ধর্মান্তরিত হয়েছে কি না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরে প্রবেশের পর এমনই হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমান পূর্ণতা লাভ করার আগ পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে কি না? উত্তরে তুমি বলেছ, তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে। তখন তোমাদের এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের ফলাফল কূপের বালতির মতো হয়ে থাকে। কখনো তিনি জয়লাভ করেন, আবার কখনো তোমরা জয়লাভ করো। তেমনি সমস্ত রাসূলও পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তম পরিণতি রাসূলগণই লাভ করে থাকেন।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন? তুমি বলেছ, না; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এমনই হয়ে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর আগে অন্য কেউ এ ধরনের দাবি করেছে কি না? তুমি বলেছ, না। তখন আমি বললাম, এ ধরনের দাবি তাঁর আগে কেউ করলে আমি বলতাম, এ এমন ব্যক্তি যে তাঁর পূর্বের কারও বলা কথার অনুসরণ করেছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর তিনি–অর্থাৎ কায়সার–বললেন, তিনি তোমাদের কি আদেশ করেন?

আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করে থাকেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করো না। পূর্বপুরুষদের আকীদা-বিশ্বাসকে বর্জন করো। তিনি আমাদের নামাজ আদায়, যাকাত প্রদান, সততা, সচ্চরিত্র এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ করেন।

হিরাক্লিয়াস বলেন, তুমি তাঁর ব্যাপারে যা কিছু বললে, এসব সত্য হয়ে থাকলে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, ইনি আসবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোনো কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি তাঁর কাছে থাকলে অবশ্যই তাঁর চরণ দুটি ধুয়ে দিতাম। খুব শীঘ্রই তিনি আমার দুই পায়ের নিচের জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন।

এরপর হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠিখানা আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল,

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে।

পরকথা এই যে, নিশ্চয় আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপ আপনার ওপর আপতিত হবে। হে আহলে কিতাব, এমন এক কথার দিকে এসো যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক ও অভিন্ন, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবো না, তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবো না। আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো; আমরা তো মুসলিম।)' [৬৬]

হিরাক্লিয়াস যখন পত্র পাঠ শেষ করলেন, তখন সেখানে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। চিৎকার, হইচই চরমে পৌঁছল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। বের হয়ে এসে আমরা আমাদের সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার ছেলের, অর্থাৎ নবীজীর, বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বনূ আসফার বাদশাও তাঁকে ভয় পাচ্ছে। তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতাম, তিনি শীঘ্রই বিজয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামে দাখিল হওয়ার তৌফিক দান করলেন। [৬৭]

---

[৬৬] সূরা আলে ইমরান : ৬৪।

[৬৭] সহীহ বুখারী : ৭।

প্রিয় নবীজীর মুজিযাসমূহ

পূর্বে আমরা মুজিযা এবং কারামাত শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা পাঠকদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় মুজিযা নিয়ে সামান্য আলোকপাত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

এ বিষয়ে আলোচনা শুরুর আগে আল্লামা কাজি ইয়াজ (র.)-এর মুজিযার সংজ্ঞাটি আমরা এখানে তুলে ধরছি।[৬৮]

তিনি বলেন,'নবীদের দ্বারা সংঘটিত সেসব ঘটনাকে মুজিযা বলে, সমগ্র সৃষ্টিজীব যার অনুরূপ কিছু করতে অক্ষম।'

মুজিযার শ্রেণিবিভাগ

মুজিযা দু প্রকার-

প্রথম প্রকারের মুজিযা মানবসাধ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেটি করতে বলা হলে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তাদের এই অক্ষমতা ও ব্যর্থতাই আল্লাহর নবীর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। এসব মুজিযার সামনে মানবজাতিকে মহান আল্লাহই অক্ষম সাব্যস্ত করেন। যেমন, কোরআনের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে না পারা।

দ্বিতীয় প্রকারের মুজিযা মানবসাধ্যাতীত। তাদের সক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই তারা তা করতে অক্ষম। যেমন, মৃতকে জীবিত করা, লাঠিকে জ্যান্ত সাপে পরিণত করা, পাথর থেকে উটনি বের করা, বৃক্ষের কথা বলা, আঙুল থেকে ঝরনা উৎসারিত হওয়া, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া। এসব কেবল আল্লাহ তাআলার কুদরতের পক্ষেই সম্ভব। তিনিই তাঁর নবীর মাধ্যমে এসব অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ করে নবীকে অস্বীকারকারীদের প্রতি অনুরূপ কিছু করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ।

এভাবে মুজিযার সামনে অস্বীকারকারী কওমের অক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়।

---

[৬৮] আশ-শিফা ১ : ২১২।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মুজিযা। শুধু মুজিযা বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, *দালাইলুন নবুয়্যাহ*, *আল-খাসাইসুন-নবুয়্যাহ*, *হুজ্জাতুল্লাহি-আলাল-আলামিন*। এরূপ আরও অসংখ্য গ্রন্থ, যেগুলোর মাধ্যমে নবীজীর সত্যতা এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণবাহি মুজিযার নির্ভেজালতা ও সুস্পষ্টতা ফুটে ওঠে।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু মুজিযা নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্য এই গ্রন্থে আমরা সংক্ষিপ্ততার রীতি অনুসরণ করেছি এবং সেভাবে অন্যান্য আলোচনা পেশ করেছি।

পবিত্র কোরআন

কালের বুকে পবিত্র কোরান হচ্ছে স্থায়ী, চিরন্তন ও অমর মুজিযা। মহাকালের মহাস্রোতপ্রবাহে এটি চিরস্থায়ী নিদর্শন। যুগ যুগ ধরে যা কেবল বিস্ময়ের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। যে বিস্ময়ের কোনো সীমা নেই। যে বিস্ময় অপার, অনন্ত।

কালের গর্ভে কত কিছু বিলীন হয়ে গেল, কত বিস্ময়কর কীর্তি মহাকীর্তি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারাল। কিন্তু এর শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকু খর্ব হয়নি। এর অলৌকিকত্ব সামান্যতম হ্রাস পায়নি।

পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব নিয়ে উলামায়ে কেরাম অগণিত কিতাব লিখেছেন। এর অলংকারপূর্ণ বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর বিস্ময়কর মর্মের বিষয়ে তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবিশ্রান্তভাবে তাঁরা সেসব রচনা করে গিয়েছেন। জীবন-যৌবন নিঃশেষ করে দিয়েছেন। নিজেদের পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রখর মেধা ও অসামান্য প্রতিভার সমস্ত সাক্ষর তাঁরা রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতেও কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারেননি।

যুগ যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে, পবিত্র কোরান ঠিক প্রথম দিনটির মতোই তত নতুন বিস্ময়ের জন্ম দিচ্ছে, নতুনত্বের পরশ বুলাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা সমগ্র জগতের হেদায়াতস্বরূপ এটি নাযিল করেছেন। মুত্তাকীদের পাথেয়স্বরূপ এটি দান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি লোকদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তাদের সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।

পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষপূর্ণ অন্তরগুলোর মাঝে সৌহার্দ্র-সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন দলের মাঝে প্রেম ও প্রীতির সুরভি ছড়িয়েছেন। শতধাবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে ঐক্য ও মৈত্রীর সেতু স্থাপন করেছেন। তাই সর্বযুগের সর্বজাতির কামিয়াবি ও সফলতার এটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন সংবিধান।

ভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল যাদের হাতে এবং এ নিয়ে যাদের দম্ভের অন্ত ছিল না, পবিত্র কোরানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আরবের সেসব বিখ্যাত বাগ্মীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং তাদের সেই দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়েছেন।

আরবি ভাষা-অলংকারের পূর্ণ অধিকারী তো তারাই ছিল। এর লাগাম তো সম্পূর্ণ তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু কোরান যখন চ্যালেঞ্জ ছুড়ল, এর ভাষার অলংকারীত্বের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে গেল। বিনম্রচিত্তে তারা এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল এবং এর অনুরূপ কোনো আয়াত পেশ করতে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করল।

কোরানের সেই চ্যালেঞ্জ জানানোর ভাষা কেমন ছিল? কি বলা হয়েছিল আমার রবের নাযিল করা মহিমান্বিত আয়াতে?

নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথাই উচ্চারিত হয়েছে দ্ব্যর্থহীনভাবে।

ইরশাদ হচ্ছে,

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

‘হে নবী, আপনি বলুন, যদি সমগ্র মানব ও জীন জাতি এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কোরানের অনুরূপ বাণী তৈরি করে আনবে, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনতে পারবে না। তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।’[৬৯]

[৬৯] সূরা বনী ইসরাইল : ৮৮।

ওলীদ ইবনুল মুগীরা, নিজের লালিত্যপূর্ণ ভাষাজ্ঞান নিয়ে তার খুব অহংকার ছিল। অহংকারে যেন পা মাটিতে পড়তো না। সে তার কাব্যপাণ্ডিত্যের সামনে সবাইকে অসহায় মনে করতো ।

কিন্তু এই ওলীদ যখন কোরানের মুখোমুখি হলো, নবীজীর মুখ থেকে মাত্র একটি আয়াত শুনল, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল।

সে নবীজীকে তেলাওয়াত করতে শুনল,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

‘নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, দয়া ও আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন। আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।’[৭০]

মুগ্ধতায় সে এতটাই আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, আবেগ লুকোতে পারেনি। অবচেতন মনে স্বীকার করে নিয়েছিল, ‘আল্লাহর শপথ! এই কোরানের মাঝে বিশেষ মিষ্টতা রয়েছে। এর বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে। এর নিম্নাংশ সুসিক্ত। উর্ধ্বাংশ ফলপূর্ণ। এই কোরান সব সময় বিজয়ী হবে। এর ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। এ কোরান সবকিছুকে চূর্ণ করে দেবে এবং সে উক্তিকেও যে বলবে এটা মানুষের কথা।’[৭১]

পবিত্র কোরান নিয়ে চিন্তা করলে তুমি দেখতে পাবে, মানুষের জীবন ও জীবনব্যবস্থা এবং পৃথিবীর শাসন ও শাসনব্যবস্থা যে আকীদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধানের সংস্পর্শে সফল ও সুশৃঙ্খল হয়, সেসব উচ্চতর বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পুনরুত্থান, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতদের বিভিন্ন ঘটনা, অতীত-ভবিষ্যতের অনেক গায়েবী ও অন্যান্য বিষয়ক এমন বিস্ময়কর তথ্য ও আলোচনা রয়েছে, যা সমস্ত সন্দেহের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

---

[৭০] সূরা নাহল : ৯০।

[৭১] আশ-শিফা ১ : ২২০। খাসায়েসুল কুবরা ১ : ১১৩।

এ কোরান আল্লাহর কালাম, কোনো ভ্রান্তি এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না এর সামনে থেকে, আর না পেছন থেকে, এটি মহাপ্রজ্ঞাবান চিরপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ–এসব বিষয়ে যাবতীয় দ্বিধা-সংশয়কে কোরান দাফন করে দিয়েছে। অথচ এটি যাঁর ওপর নাযিল হয়েছিল, তিনি উম্মী ছিলেন। পড়ালেখা জানতেন না। তাঁর না কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল, আর না কোনো জ্ঞানীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল। তদুপরি বেড়ে উঠেছিলেন নিরক্ষর এক জাতির মাঝে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে ইরশাদ হচ্ছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।[৭২]

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুশরিকদের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলো। যেমন, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, আবু জেহেল, ইবনে হিশাম, আছ ইবনে ওয়ায়েল, আছ ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগুছ, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ, জামআ ইবনে আসওয়াদ, নযর ইবনে হারেছ সহ আরও অনেকে। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের চাঁদটি দু টুকরো করে দেখাও। অর্ধেক আবু কুবাইস গোত্রের ওপর এবং অর্ধেক কাইকুআনের ওপর। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এমনটি করে দেখালে কি তোমরা ঈমান আনবে? তারা বলল, হাঁ। পূর্ণিমার রাত ছিলো। নবীজী তাঁর রবের দরবারে তাদের দাবি অনুযায়ী তাঁর চাওয়া পূরণের দোআ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটি

[৭২] সূরা জুমুআহ : ২।

দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল তখন সবাইকে ডেকে বললেন, হে আবু সালামা, হে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম, তোমরা সাক্ষী থাক।'[৭৩]

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কার চাঁদ দু টুকরো হয়ে এক খণ্ড পাহাড়ের ওপর পড়েছিল। আরেক খণ্ড পাহাড়ের নিচে। তখন নবীজী বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তোমরা সাক্ষী থাক। তখন কুরাইশের কাফেররা বলল, আবু কাবশার বেটা তোমাদের জাদু করেছে। তবে মুহাম্মাদ চন্দ্রকে জাদু করতে পারলেও গোটা পৃথিবী যাদু করতে পারবে না। সুতরাং ভিনদেশ থেকে তোমাদের কাছে যারা আগমন করে তাদের জিজ্ঞাসা করো-তারা তা দেখেছে কি না?'

তারপর ভিনদেশি লোকেরা এলে তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল। তখন তারা জানাল, হাঁ, তারা তেমনই দেখেছে। এ কথা শুনে তারা বলল, এটি একটি অব্যাহত জাদু। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন,

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ.

> 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তারা যখন কোনো নিদর্শন দেখে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু।'[৭৪]

শাইখ হামজা ফাতহুল্লাহ বলেন,[৭৫] 'ভিনদেশি এক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। আরবি পত্রিকা *ইনসান* অনুবাদ ছেপেছিল সেই প্রবন্ধের। প্রবন্ধের মূল কথা ছিল, চীনে অতি প্রাচীন এক ভবনের সন্ধান মিলেছিল, যাতে লেখা ছিল, 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আসমানী মহা বিপর্যয়ের বছর এটি নির্মাণ করা হয়েছে'।'

তখন তারা গাণিতিক সূত্র মিলিয়ে হিসেব বের করে দেখল, এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।

---

[৭৩] আবু নুআইম কৃত দালাইলুন নাবুয়্যাহ ১ : ৯৫।

[৭৪] সূরা ক্বামার : ১-২। সহীহ বুখারী : ৪৮৬৪; মুসলিম : ২৮০০।

[৭৫] তার কৃত বাকুরাতুল কালাম আলা হুকুকিন নিসা ফিল ইসলাম নামক গ্রন্থে : ৪১।

খাবারে বরকত

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেলাম। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাছে কী কিছু আছে? কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব ক্ষুধার্ত দেখেছি। এ কথা শুনে সে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক ছা' পরিমাণ যব বের করে দিলো। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করে ফেলল।। গোশত কেটে কেটে আমি ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলাম। তখন আমার স্ত্রী বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের নিকট আমাকে লজ্জিত করবেন না। তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাকে চুপি চুপি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমরা আমাদের একটি বকরির বাচ্চা জবাই করেছি এবং আমাদের কাছে এক ছা' যব ছিল তা পিষে এনেছি। আপনি সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে সবাইকে ডেকে বললেন, হে খন্দকবাসী, জাবির তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছে। এসো; তোমরা সকলেই দ্রুত এসো।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও বানাবে না। আমি তখন বাড়িতে ফিরে এলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে তিরস্কার করতে লাগল। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। (কারণ নবীজী অনেক লোক নিয়ে এসেছিলেন। অথচ খাবার ছিল সামান্য, যা আসলেই লজ্জার বিষয়।)

তখন আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর আমি আল্লাহর রাসূলের সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোআ করলেন। তারপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং তাতে বরকতের দোআ করলেন। তারপর বললেন, একজন রুটি তৈরিকারিণীকে ডাকো। সে তোমার সঙ্গে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত পরিবেশন করুক। তবে চুলো থেকে তোমরা ডেকচি নামাবে না।

সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় ছিলেন এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা সকলে পেট ভরে খেলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতো তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের খামির থেকে আগের মতো রুটি তৈরি হচ্ছিল।'

আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুজিযা সম্পর্কিত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য সাহাবি সেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত সাহাবি হযরত আনাস ইবনে মালিক, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুম অন্যতম।

ইমাম বুখারী (র.) থেকে বর্ণিত, আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। পথ চলতে চলতে সফরের এক জায়গায় নামাজের সময় হলো। কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেল না। কাফেলার এক ব্যক্তি (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই) গিয়ে একটি পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে এলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রটি হাতে নিয়ে তার পানি দিয়ে অজু করলেন। তারপর হাতের চারটি আঙুল পাত্রের মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। সাহাবিদের বললেন, উঠো; তোমরা সকলে অজু করে নাও। তখন সবাই অজু করে নিল। তাঁদের সংখ্যা ছিল সত্তরজন।'[৭৬]

নিজ এলাকায় কিংবা সফরে, আবাসে কিংবা প্রবাসে রাসূলুল্লাহর এই বিস্ময়কর মুজিযাটি অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং ইমাম মালেক (র.)[৭৭] এ সম্পর্কিত একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেসব বর্ণনায় অজু করা সাহাবিদের সংখ্যা কখনো ষাট, কখনো সত্তর, কখনো তিনশত ছিল।

ইমাম বুখারী (র.)[৭৮] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হুদায়বিয়ার দিন সবাই পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। নবীজীর সামনে একটি চামড়ার পাত্রে সামান্য পানি ছিল। তিনি সেই পানি দিয়ে অজু

---

[৭৬] সহীহ বুখারী : ৫২৭৪।

[৭৭] সহীহ বুখারী : ৩৫৭২, ৩৫৭৩, ৫২৭৪। সহীহ মুসলিম ১৫ : ৩৮। মুয়াত্তা মালেক ১ : ৪১।

[৭৮] সহীহ বুখারী ১৭ : ২১৪। সহীহ মুসলিম ১৩ : ৪।

করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী হলো তোমাদের? তাঁরা বলল, আপনার সামনের চামড়ার পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের কাছে অজু ও পান করার মতো কোনো পানি নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পাত্রে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের মধ্য ফোয়ারার মতো পানি বের হতে লাগল। আমরা সবাই তখন পান করলাম, ওজুও করলাম। জাবেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেদিন তোমরা কতজন ছিলে? তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় এক লাখ হলেও পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো । তবে আমাদের সংখ্যা পনেরোশ ছিলা।'

ইমাম বুখারী (র.)[৭৯] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আমরা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে পানি স্বল্পতা দেখা দিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তোমরা (তোমাদের কারও কাছে) পানি অবশিষ্ট আছে কিনা দেখ। তখন তারা (খোঁজ করে) একটি পাত্র নিয়ে আসলেন। পাত্রটিতে সামান্য পানি ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, আল্লাহর রাসূলের আঙুলের ভেতর থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারী (র.) থেকে বর্ণিত,[৮০] ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, 'এক সফরে আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা এসে তাঁর কাছে পিপাসার কষ্টের কথা জানাল। তিনি তখন যাত্রাবিরতি করলেন। তারপর অমুককে ডাকলেন (এক বর্ণনামতে তিনি স্বয়ং ইমরান ইবনে হুসাইনই ছিলেন) এবং আলীকে ডাকলেন। তারপর বললেন, তোমরা দুজন গিয়ে পানির খোঁজ করো। তারপর তারা পানির খোঁজে বের হলেন। পথিমধ্যে এক মহিলাকে তাঁরা দুই মশক পানি উটের পিঠে করে নিতে দেখলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পানি কোথায়? আমি গতকাল এই

---

[৭৯] সহীহ বুখারী ১৬ : ১২। সুনানে তিরমিযী ১৩ : ১১৪।

[৮০] সহীহ বুখারী : ৩৫৭১।

সময়ে আমি কূপের কাছে ছিলাম (অর্থাৎ এখান থেকে একদিনের সমপরিমাণ দূরত্বে পানি রয়েছে)। আমার গোত্র পেছনে রয়ে গেছে। তারা বললেন, এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো, কোথায়? তারা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে।

মহিলাটি বলল, সেই লোকটির কাছে যাকে 'সাবি' (ধর্মত্যাগী) বলা হয়? তারা বলল, হাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা, এখন চলো। তারা মহিলাটিকে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং পুরো ঘটনা খুলে বললেন। লোকেরা মহিলাটিকে উটের পিঠ থেকে নামালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র আনতে বললেন। এরপর মহিলার মশক দুটির মুখ খুলে সেই পাত্রে পানি ঢেলে সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর মশকের উপরের মুখ বন্ধ করে নিচের মুখ খুলে দিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা নিজেরাও পান করো এবং তোমাদের জন্তুদেরও পান করাও। তখন যার ইচ্ছা পান করলো। আর যার ইচ্ছা জন্তুকে পান করালো। মহিলাটি এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তার পানি নিয়ে তারা কী করে। সে খুব অবাক হচ্ছিল। আল্লাহর কসম যখন তার মশক থেকে পানি নেওয়া শেষ হলো তখন আমাদের মনে হলো, মশকগুলো আগের চেয়েও বেশি ভরপুর।

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মহিলার জন্য কিছু একত্র করো। তখন তারা আজওয়া খেজুর, আটা ও ছাতু একত্র করলেন। খাদ্যসামগ্রীগুলো একত্র করে তাঁরা তা একটি কাপড়ে বাঁধলেন। তারপর মহিলাকে উটের উপর বসিয়ে দিলেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁটরিটি রেখে দিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ভালো করেই জানো, আমরা তোমার পানি একটুও কম করিনি; বরং আল্লাহ তাআলাই আমাদের পান করিয়েছেন। এরপর মহিলাটি নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গেল। তার বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে অমুক, এত দেরী হলো কেন? সে বলল, একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, দুজন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গেল যাকে 'সাবী' (ধর্মত্যাগী) বলা হয়। আর সেখানে সে এ সব করলো। এ কথা বলে সে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দিয়ে আসমান ও জমিনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহর কসম! সে এ দুয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়

জাদুকর, নয়তো সে বাস্তবেই আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনার পর যখন মুসলমানগণ ওই মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের ওপর হামলা করতেন, তখন মহিলার গোত্রের লোকদের কোনো ক্ষতি করতেন না। একদিন মহিলা তার গোত্রের লোকদের বলল, আমার মনে হয় তারা ইচ্ছে করে তোমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং মুসলমান হয়ে গেল।

মিরাজের ঘটনা

হিজরতের এক কিংবা দুবছর পূর্বে মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কালামে পাকে মহান রাব্বুল আলামিন মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে أسرى (আসরা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটি إسراء (ইসরা) থেকে উদ্ভূত। অর্থ : রাতে ভ্রমণ করা। আইম্মায়ে কেরাম ইসরা সম্পর্কিত অনেক সহীহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁদের থেকে সেসব বর্ণনা করেছেন। মিরাজের বিষয়টি পবিত্র কোরান ও অনেক সহীহ হাদিসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায় আইম্মায়ে কেরামের অভিমত হলো, আল্লাহর রাসূলের মিরাজের বিষয়টি কেউ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে, তার ঈমান চলে যাবে।

রাসূলের পবিত্র মিরাজ সম্পর্কে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস থেকে আমরা এখানে শুধু একটি হাদিসের অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতের পরদিন সকালে এক দল কুরাইশের কাছে গেলেন। রাতের বেলা বাইতুল মুকাদ্দাস গমন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যেসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, সেগুলো বর্ণনা করলেন। বিষয়টি অনেক বিস্ময়কর মনে হলো তাদের কাছে। বলল, আমাদের বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিন। তখন তাঁর সামনে আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের ছবি তুলে ধরলেন। তিনি তা দেখে দেখে তাদের সব হুবহু বর্ণনা করলেন।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, তারা তাঁকে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, এর প্রমাণ কী? এমনটি তো আমরা কখনো শুনিনি। তখন তিনি বললেন, এর প্রমাণ- আমি অমুক গোত্রের অমুক কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। আমার বোরাক

দেখে তারা ভয় পেয়েছিল। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, আমি তাদের সেই উটের সন্ধান বলে দিয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। ফেরার পথে যখন মক্কার নিকটবর্তী 'যাজনান' পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম, তখন সেই কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। এর প্রমাণ, তাদের কাফেলাটি এখন তানঈম উপত্যকার সরু পথ দিয়ে অতিক্রম করছে। কাফেলার সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট রয়েছে। উটের পিঠে দুটি বস্তা রয়েছে, একটি কালো বস্তা, অপরটি উজ্জ্বল রংয়ের। তখন তারা দ্রুত সেই সরু পথের দিকে বের হলো (সত্যতা যাচাই করার জন্য)। প্রথমেই তারা সেই উটটিকে দেখল। মক্কায় এলে তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল। তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য বলেছেন। তিনি যেই উপত্যকার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে আমরা ভয় পেয়েছিলাম এবং আমাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা এক লোকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি আমাদের সেই উটের সন্ধান বলে দিয়েছিলেন। আমরা গিয়ে তখন উটটি নিয়ে এলাম।'[৮১]

৫৪ ইমাম আহমাদ, ইবনে আবি শায়বা, ইবনে ইসহাক, বায়হাকী (র.) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন।

নবীজীর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য-

মহান আল্লাহ মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে সম্মানীত ব্যক্তিদের নবী হিসেবে নির্বাচন করেন; যেন তাঁরা তাঁদের উম্মতদের জন্য রাহবার ও আলোর দিশারি, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং উত্তম আদর্শে পরিণত হতে পারেন।

রাসূলদের আলোচনা এবং রিসালাতের মাধ্যমে তাঁদের নির্বাচনের বর্ণনা তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

'আর প্রত্যেককেই আমি বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর তাঁদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কতককে। আর আমি তাঁদের নির্বাচিত করেছিলাম এবং তাঁদের সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।'[৮২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে সমগ্র বিশ্বজগতের ওপর যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদের একজনকে অপরজনের ওপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের মাঝে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে তারতম্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ.

'ওই রাসূলগণ, তাঁদের কতককে আমি কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাঁদের মাঝে এমনও রাসূল রয়েছেন, যার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন আর তিনি তাঁদের কতিপয়ের মর্যাদা উন্নীত করেছেন।'[৮৩]

---

[৮২] সূরা আনআম : ৮৬-৮৭।

[৮৩] সূরা বাকারা : ২৫৩।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

'আর অবশ্যই আমি নবীদের কতিপয়কে কতিপয়ের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।'[৮৪]

সকল নবী-রাসূল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁকে সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি দিক, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সকল নবী-রাসূল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের সময়কালে প্রেরিত হলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর অনুসারী ও সাহায্যকারী হবেন।

হযরত আলী এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল নবীর কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাঁদের কারো জীবদ্দশায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলে তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর কওমের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন, তাঁদের জীবদ্দশায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলে তারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে।' তারপর আলী (রা.) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

[৮৪] সূরা ইসরা : ৫৫।

'স্মরণ করুন ওই সময়কে, যখন আল্লাহ তাআলা নবীদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদের কিতাব ও হেকমত যা কিছু দান করেছি, তারপর তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে একজন রাসূল যখন তোমাদের কাছে আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং সে ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো। আর আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী হিসাবে থাকব।'[৮৫]

মূলত সকল নবী-রাসূলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের সবার ওপর নবীজীর শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা, তাঁর উচ্চকিত প্রশংসা করা এবং তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা। যদিও মহান আল্লাহ জানতেন, নবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময়কাল পাবেন না এবং তিনিই হবেন সর্বশেষ রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

'মুহাম্মাদ তোমাদের কারও পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'[৮৬]

রেসালাতের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা অপর যে বৈশিষ্ট্যটি দান করেছিলেন, তা হচ্ছে তাঁর রেসালাতের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতা। অন্য কোনো রাসূলের রেসালাতের এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রেসালাতকে বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন করেছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির নবী। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ

[৮৫] সূরা আলে ইমরান : ৮১

[৮৬] সূরা আহযাব : ৪০।

করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

'আর আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[৮৭]

ইমাম বুখারী (র.) থেকে বর্ণিত, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

'আমাকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি। ১.আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা এক মাস দূরত্বেও প্রতিফলিত হয়। ২. গোটা পৃথিবীর জমিনকে আমার জন্য সালাত আদায়ের উপযোগী ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোনো লোক সালাতের ওয়াক্ত হলেই সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। ৩. আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার আগে এটি কারও জন্য হালাল ছিল না। ৪. আমাকে কেয়ামতের দিন বড় সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫. সকল নবীকে কেবল তাঁর কওমের জন্য প্রেরণ করা হতো। আর আমাকে গোটা মানবজাতির (হেদায়াতের) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৮৮]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،

---

[৮৭] সূরা সাবা : ২৮।

[৮৮] সহীহ বুখারী : ৩৩৫।

وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

'ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ১. আমাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা সুসংক্ষিপ্ত ও মর্মসমৃদ্ধ কথা দান করা হয়েছে। ২. প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. গোটা জমীনকে আমার জন্য মসজিদ এবং সালাত আদায়ের উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. আর আমার মাধ্যমে নবীদের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।'[৮৯]

শাফায়াতের অধিকার প্রদান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মহান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেয়ামতের দিন ব্যাপকভাবে সর্বোচ্চ শাফায়াত করার সুযোগ লাভ। সেদিন সকল মানুষ নবীদের কাছে যাবে। তারপর তাদের কাছে নিবেদন করবে, আপন রবের কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। কিন্তু তারা তাঁদের কাছে কোনো শাফায়াত পাবে না। তারা এক নবীর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে অন্য নবীর কাছে যাবে। সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবে। সবশেষে মানুষ সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে। আর তিনিই হবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত সুপারিশকারী এবং অব্যর্থ প্রার্থনাকারী।

হযরত আবু হুরায়রা (র.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ

[৮৯] সহীহ মুসলিম : ৫২৩।

يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ، مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى،

فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ - أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

‘কেয়ামতের দিন আমি হব মানবকুলের সর্দার। তোমরা কি জান তার কারণ কী? আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আগে ও পরের সকল মানুষকে এমন এক ময়দানে একত্রিত করবেন, যেখানে সবাই সবাইকে দেখতে পাবে এবং সকলে আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনতে পাবে। সূর্য মানুষের অতি নিকটে এসে যাবে। অসহনীয় আর নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হবে মানুষ। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক কিছু লোককে বলবে, আদম আলাইহিস সালামের কাছে চল। তখন তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম, আপনি সব মানুষেরর পিতা।

আল্লাহ আপনাকে তাঁর কুদরতি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সেজদা করেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপাারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি?

তিনি বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এতটা ক্রোধান্বিত হয়েছেন যে, আগে কখনো এতটা ক্রোধান্বিত হননি। আর পরেও কখনো এতটা ক্রোধান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে নিষিদ্ধ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা শুনিনি। নাফসী! নফসী! নাফসী! (আমি নিজেই নিজের চিন্তাতে ব্যস্ত)। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা বরং নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যাও।

তখন তারা নূহ আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, হে নূহ, পৃথিবীবাসীদের নিকট প্রেরিত আপনি প্রথম রাসূল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না?

তখন তিনি তাদের বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, আগে কখনো এমন রাগান্বিত হননি, আর পরেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণযোগ্য দোআ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি। নাফসী! নাফসী! নাফসী ! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও।

তখন তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তাঁর বন্ধু। আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কী কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি? তখন তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত

যে, আগে কখনো এতটা রাগান্বিত হননি। আর পরেও কোনোদিন হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। তিনি সেগুলো স্মরণ করে নাফসী নাফসী নাফসী বলতে থাকবেন। আর বলবেন, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও।

তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, হে মূসা, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর রেসালাতের এবং তাঁর সঙ্গে কালামের মাধ্যমে সকল মানুষের ওপর আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কী বিপদের মধ্যে আছি?

তখন তিনি বলবেন, নিশ্চয় আমার রব আজ এতটা ক্রোধান্বিত হয়েছেন যে, আগে কখনো এতটা ক্রোধান্বিত হননি। আর পরেও কোনোদিন হবেন না। আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম যাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। নাফসী! নাফসী! নাফসী! তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও।

তখন তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, হে ঈসা, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়াম আলাইহিস সালামের প্রতি প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন। আপনি তাঁর পক্ষ থেকে রুহ। দোলনায় থাকতেই আপনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কী কঠিন অবস্থায় আছি? তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, আমার রব আজ এত রাগান্বিত যে তিনি পূর্বে কখনো এত রাগান্বিত হননি। আর পরেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোনো গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। শুধু বলবেন, নাফসী! নাফসী! নাফসী! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।

তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগে পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় আছি?

তখন আমি আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তাআলা আমার সামনে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির সমস্ত দরজা খুলে দেবেন, যা ইতোপূর্বে আর কারও সামনে খুলেননি। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তা-ই তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ করো; তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠিয়ে সুপারিশ করব, আমার উম্মত হে আমার রব! আমার উম্মত হে আমার রব! আমার উম্মত হে আমার রব! তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আপনার উম্মতের মধ্যে যেসব লোকের হিসাব-কিতাব হবে না তাদের জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তাদের স্বাধীনতা আছে, তারা অন্য লোকদের সঙ্গে এ দরজা ছাড়া অন্য যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের এক দরজার উভয় পার্শ্বের মাঝে ব্যবধান হলো মক্কা ও হিময়ার-ইয়ামানের শহর-এর দূরত্বের সমান। অথবা মক্কা ও বুসরা-সিরিয়ার শহর-এর মাঝে ব্যবধানসম।'[৯০]

[৯০] সহীহ বুখারী : ৪৭১২। ফাতহুল বারী : ১১ : ৫১৯-৫২১।

নবীজীর বর্ণিল আকৃতি ও সুমহান প্রকৃতি[৯১]

তুমি প্রিয় নবীজীর সীরাতকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করলে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবে যে, সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার এমন শীর্ষ চূড়ায় ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান, একজন মানুষ যত বড় প্রতিভাধর, জ্ঞানী এবং উচ্চাভিলাষীই হোক না কেন, তার পক্ষে সে চূড়ায় পৌঁছা কখনো সম্ভব নয়।

প্রিয় পাঠক, তোমার সামনে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। তুমি সেগুলো অধ্যয়ন করো এবং মানবসৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মহামানবদের জীবনী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো।

তুমি সেসব মহামানবদের জীবন ও কর্ম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের এমন কোনো ঘটনা আমাদের শোনাতে পারবে না, যা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাদের বর্ণনাকে ম্লান করতে পারে। তাদের এমন কোনো আলোচনা পেশ করতে পারবে না, যা প্রিয় নবীজীর জ্যোতির্ময় জীবনের কোনো অধ্যায়ের সঙ্গে তুল্য হতে পারে।

অবশ্যই আমি তোমাকে নবীজীর আখলাক ও আদাব, মহান চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা, সার্বক্ষণিক আল্লাহর ইবাদতমগ্নতা এবং তাঁর জীবনের অন্যান্য মহান দিকগুলো সম্পর্কে বলব।

এ সব আলোচনা পড়ার সময় একটি বিষয় তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংক্ষিপ্ত নবুয়তি জীবনের প্রায় দশটি বছর কুরাইশ ও অন্যান্য কাফেরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ-সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন। এ বিরামহীন যুদ্ধ-সংগ্রাম এবং এর জন্য গৃহীত মহাপরিকল্পনা ও বিশাল প্রস্তুতিও তাঁকে মাওলার ইবাদতে পূর্ণ আত্মনিবেদন এবং তাঁর সকাশে সদা উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পারেনি তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরামের তালীম ও তারবিয়াত গ্রহণ এবং দীনের

---

[৯১] তোমার কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তুমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মধুরিমা অংশটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে। এখানে তাঁর উন্নত চরিত্র, মহৎ ও বিশুদ্ধ স্বভাব-প্রকৃতির যেসব দিক আলোচিত হয়েছে সেসব নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ফিকির করবে; যাতে তুমি এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারো এবং এমন কিছু আহরণ করতে পারো, যা তোমাকে আদর্শ জীবন দান করবে এবং তোমার মাঝে মহৎ চরিত্র ও শিষ্টাচারের ফুল ফোটাবে।

যাবতীয় বিধিবিধান শেখার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে। তিনি তাদের ওয়াজ-নসিহত করতেন। দীনের আহকাম ও বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। কর্ণকে আচ্ছন্ন করে ফেলা ও অন্তরের গভীরে রেখাপাত করা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন।

একই সঙ্গে তিনি তাঁর পতাকাতলে এসে আশ্রয় নেওয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শাসননীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। পারস্পরিক বিরোধের আগুন নেভাতে তাদের মাঝে আপস-মীমাংসা ও সমঝোতা বিধানের কাজ করতেন।

তুমি যখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাববে, তখন তোমার সকল দ্বিধা-সংশয় দূরীভূত হয়ে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেবে যে, একসঙ্গে এত মহৎ ও মহান সব কাজ সফল ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া কোনো মানবসন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। রাব্বুল আলামীনের বিশেষ সাহায্যগুণে কেবল তা সম্ভব হয়েছিল। যিনি নবীজীর ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত করেছিলেন এবং তাঁর মাঝে এমন প্রশংসনীয় গুণাবলি, মহৎ কীর্তি ও অতুলনীয় সৌন্দর্যের সমাহার ঘটিয়েছিলেন, সর্বযুগে ও সর্বদেশে যা দৃষ্টান্তহীন। পৃথিবীর কোনো মহান ব্যক্তির জীবনচরিত মুহাম্মাদী জীবনচরিতের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। পারে না তার বিকল্প হতে।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক ও শামায়েল বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থে তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত, আদেশ-নিষেধ, নিদ্রা-জাগরণ, চলাফেরা, উঠাবসা, পানাহার, পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন।

এসব গ্রন্থে তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রীতি-ক্রোধ, হাসি-কান্না, সরবতা-নীরবতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, বদান্যতা, ক্ষমা, লজ্জা, বিনয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, অজু-গোসল এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতির বর্ণনা পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান যুগে ইসলামের প্রতি আগ্রহী অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, যারা আল্লাহর নবীর অনন্য, অনুপম, মহান চরিত্র সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান রাখে। তবে সে জ্ঞানটুকুও নিঁখাদ, নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ নয়। তাদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান থাকবে, তারা যেন নবীজীর শামায়েল বিষয়ক যে-কোনো একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নিজেদের পাঠ তালিকায়

রাখে। এতে তারা প্রিয় নবীজীর ব্যক্তিসত্তার সকল গুণাগুণ ও সকল অবস্থার সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তাদের জন্য তখন আচার-আচরণে, কর্মে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে নবীজীর আদর্শের অনুসরণ করা সহজ হবে। সেই সঙ্গে তাদের কোরানের মহান বাণীর ওপরও আমল করা হবে। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا.

'বস্তুত রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[৯২]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিল আকৃতি ও অনুপম প্রকৃতি বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) বিরচিত *শামায়েলে মুহাম্মাদিয়্যা।* আমরা এখানে বিখ্যাত সেই গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু অংশ তুলে ধরব। আশা করি তা চক্ষুষ্মানদের জন্য চোখের জ্যোতি, জ্ঞানীদের জন্য দিকনির্দেশক এবং সত্যানুসন্ধানীদের জন্য উত্তম দিশারি হবে।

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথা বলতেন। উপস্থিত সকলেই তা আত্মস্থ করতে পারত। শ্রোতাদের ভালোভাবে বোঝার স্বার্থে তিনি (প্রয়োজনে) কোনো কোনো কথা তিনবার করে বলতেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। আল্লাহর নাম নিয়ে কথা শুরু করতেন এবং আল্লাহর নামে শেষ করতেন। সুসংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কথা বলতেন। পার্থিব কোনো বিষয়ে কখনও রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। তবে শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে সেটার প্রতিবিধান করার আগ পর্যন্ত কোনো কিছু তাঁর ক্রোধের সামনে টিকতে পারতো না। ব্যক্তিগত কারণে কখনও তিনি রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে সাহসী ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার একটি ঝলক নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে। হযরত আলী (রা.) বলেন,

---

[৯২] সূরা আহযাব : ২১।

إِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ وَاحْمَرَّتِ الْحَدَقُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

'যখন ঘোরতর যুদ্ধ হতো, চক্ষু লাল হয়ে যেতো, তখন আমরা তাঁকে সামনে রেখে তাঁর পেছনে থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা করতাম। সেসময় তিনিই শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকতেন। বদর যুদ্ধের দিন আমি দেখেছি, আমরা পেছন থেকে আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করছি। আর তিনি আমাদের মাঝে শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। এদিন তাঁর চেয়ে সাহসী ও বীর যোদ্ধা আর কেউ ছিল না।'[৯৩]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ.

'সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা (সওয়াব প্রদান করতে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়। আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল তাই, যা সর্বদা পালন করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।'[৯৪]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণের সঙ্গে হাস্যরসিকতা করতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও আমাদের সঙ্গে কৌতুক করেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। তবে আমি কেবল সত্য কথাই বলে থাকি। (এমনকি কৌতুকেও)।

---

[৯৩] নাসায়ী, বায়হাকি, তাবারানি, বদর যুদ্ধের...–এখান থেকে হুবহু হাদিসের শেষাংশটি রয়েছে মুসনাদে আহমাদে, ১ : ৮৬।

[৯৪] সহীহ মুসলিম : ৭৮৫।

অধিকাংশ সময় তিনি মৃদু হাসতেন। ঘুমাতে যাওয়ার সময় এই দোআ পড়তেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ آوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَه وَ لَا مُؤْوِيَ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে পানাহার করিয়েছেন। আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। কত লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূরণের কেউ নেই এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করারও কেউ নেই।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি উঠে অনেক লম্বা নামাজ পড়লেন। তারপর সেজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'হে প্রভু! আপনি কি আমায় প্রতিশ্রুতি দেননি যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আপনি তাদের আযাব দেবেন না? এই তো আমরা ইসতেগফার করছি।'

নবীজীর দুরাকাত নামাজ পড়া যখন শেষ হলো, তখন সূর্যের গ্রহণ কেটে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পড়লেন। তারপর বললেন, 'নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এতে গ্রহণ লাগে না। চন্দ্র-সূর্যে যখন গ্রহণ লাগে, তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহকে স্মরণে করবে।'

একজন নারী নবীজীর কাছে এসে তাঁকে বলল, আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তুমি শহরের যে কোনো রাস্তায় গিয়ে বস। আমি তোমার কাছে আসছি।

তিনি হেলান দিয়ে বসে আহার করতেন না। বলতেন, খাবারের বরকত হচ্ছে খাবারের আগে ও পরে দুই হাত ধোয়া।

খাওয়ার আদব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে। তারপর ডান হাতে তোমার কাছ থেকে খাবে।[৯৫]

[৯৫] সহীহ বুখারী : ৫৩৭৬। সহীহ মুসলিম : ২০২২।

খাবার শেষ করে তিনি এই দোয়া পড়তেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ.

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে আহার দান করেছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও বাড়িতে গেলে ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়াতেন না। দরজার ডান অথবা বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন । তারপর সালাম বলতেন, (আস-সালামু আলাইকুম, আস সালামু আলাইকুম)

সমস্ত বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করতেন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে এসে খাবার পানি চাইলেন। আমরা তখন বকরির দুধ দোহন করে তাতে পানি মিশিয়ে তাঁর সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি তখন পান করলেন। আবু বকর (রা.) নবীজীর বা দিকে ছিলেন। উমর (রা.) ছিলেন তাঁর সামনে। আর একজন বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করা শেষ করলে উমর (রা.) আবু বকর (রা.)-কে দেখিয়ে বললেন, এই যে আবু বকর ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবু বকর ও উমরকে না দিয়ে তাঁর ডান দিকে থাকা বেদুঈনকে দুধ পান করতে দিলেন। আর বললেন,

اَلْأَيْمَنُوْنَ، اَلْأَيْمَنُوْنَ، اَلْأَيْمَنُوْنَ،

অর্থাৎ 'ডানে থাকা লোকের আছে অগ্রাধিকার। ডানে থাকা লোকের আছে অগ্রাধিকার। ডানে থাকা লোকের আছে অগ্রাধিকার।'[৯৬]

বিখ্যাত সাহাবি হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'এটাই সুন্নত, এটাই সুন্নত, এটাই সুন্নত।' কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার আব্বা আলী ইবনে আবী তালেব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রবেশ' (অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরীণ

[৯৬] সহীহ মুসলিম : ২০২৯।

অবস্থা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি ঘরে গিয়ে তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। একাংশ আল্লাহর ইবাদতের জন্য আরেকাংশ নিজের পরিবারের সাহচর্যের জন্য। অপরাংশ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদির জন্য। নিজের ব্যক্তিগত অংশটির আবার কিছু অংশ সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের জন্য সংরক্ষিত রাখতেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন।

বিশেষ সাহাবিদের ওপর সাধারণ সাহাবিদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। তাদের থেকে কোনো অংশই সংরক্ষিত রাখতেন না। মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রাখা সময়ের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল, তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে গুণী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া এবং দানের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনুপাতে তাদের সময় দেওয়া। (এটা ঘরে যাওয়ার পরের অবস্থা অন্যথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আগমন করা কাউকেই ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর কাছ থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরতো না)

এদের মাঝে কারও একটি, কারও দুটি কিংবা কারও বা ততোধিক প্রয়োজন থাকত। তিনি তাদের নিয়ে ব্যস্ত মগ্ন হতেন এবং এবং তাদের ও সকলের জন্য কল্যাণ ও হিতকর ব্যবস্থা প্রদান করতেন এবং তাদের করণীয় কী তা বলে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতেন, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে তা পৌঁছে দেয়। আর যে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না তোমরা তার হয়ে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেবে। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো ক্ষমতাবানের (কর্তৃপক্ষের) নিকট এমন ব্যক্তির কথা পৌঁছে দেয়, যে নিজে তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পদদ্বয় স্থির অবিচল রাখবেন।

লোকেরা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নবীজীর কাছে আসত। তবে কিছু-না-কিছুর স্বাদ আস্বাদন করেই তারা বের হতো। তারা সেখান থেকে কল্যাণের পথপ্রদর্শকরূপে বের হয়ে যেত।

হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার বাবাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের বাইরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁর আচরণ তখন কেমন হতো? তখন তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। লোকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের বিরূপ বিতৃষ্ণ করে দূরে সরিয়ে দিতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানীত ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান দিতেন এবং তাঁকে

তাদের সরদার বানাতেন। লোকদের অন্যায় আচরণ থেকে সতর্ক করতেন। নিজেও তাদের থেকে সতর্ক থাকতেন। তবে তাদের কারও থেকে তাঁর প্রসন্ন আচরণ ও মহান নৈতিকতা গুটিয়ে রাখতেন না। সদা হাস্যোজ্জ্বল, কোমল ও নরম স্বভাবের ছিলেন। অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলতেন। কাউকে নিরাশ করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত রেখেছিলেন :

১.ঝগড়া-কলহ। ২. অতিকথন। ৩. অপ্রয়োজনীয় কথা।

লোকদের তিনি তিনটি বিষয় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ১. কখনো কাউকে লজ্জা দিতেন না। ২. কারও গীবত করতেন না। ৩. কারও দোষ তালাশ ও ছিদ্রান্বেষণ করতেন না।

সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের কারও অবস্থা জানতে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতেন। সুন্দরকে সুন্দর বলতেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কুৎসিতকে কুৎসিত বলতেন এবং সেটাকে দুর্বল করে দিতেন। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী, ভারসাম্যপূর্ণ ও বিশৃঙ্খলামুক্ত ছিলেন। লোকেরা যাতে উদাসীন এবং সত্যবিচ্যুত না হয় সে জন্য তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতেন। সব রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য তাঁর কাছে ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি থাকত। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা ও শিথীলতা করতেন না। আবার সীমালঙ্গনও করতেন না। শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকেরাই তাঁর কাছাকাছি ও ঘনিষ্ট থাকত। সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কাছে তারাই বিবেচিত হতো, যারা মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী ও হিতাকাক্ষী ।

হুসাইন (রা.) বলেন, 'আমি আমার বাবাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় আল্লাহর যিকির ও স্মরণের সাথে উঠাবসা করতন । কোনো মজলিশে উপস্থিত হলে মজলিশের শেষ প্রান্তেই বসে যেতেন এবং মানুষদেরও এমন করার নির্দেশ দিতেন। মজলিশে উপবিষ্ট সকলের প্রতি তিনি সমান মনোযোগ ও দৃষ্টি প্রদান করতেন। মজলিশের কারও এমন ধারণা হতো না যে, তার চেয়ে কেউ নবীজীর কাছে অধিক সম্মানের পাত্র। কেউ যদি কোনো প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে বসতো বা দাঁড়াতো, ওই ব্যক্তি ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যধারণ করতেন ।

কোনো প্রয়োজনে কেউ তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইলে, তিনি তাকে সেটা না দিয়ে বিদায় করতেন না। কিংবা (দেওয়া সম্ভব না হলে) তাকে সান্ত্বনাদায়ক

কোনো কথা বলে বিদায় করতেন। সবার সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ও সদাচরণ করতেন। তাই তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। তাঁর কাছে তাদের সকলেরই সমান অধিকার ছিল।

তাঁর মজলিশ ছিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মজলিশ, যেখানে কারও গলার আওয়াজ উঁচু হতো না, কারও অন্দর-অন্তঃপুরের (পারিবারিক ও ব্যক্তিগত) দোষচর্চা হতো না এবং খুঁটিনাটি দোষত্রুটির চর্চাও হতো না। তারা সকলে তাঁর কাছে সমস্তরের ছিলেন। তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মানদণ্ডে তাঁর কাছে তারা একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন। সকলে বিনয়াবনত। সেখানে তারা বড়কে সম্মান করতেন, ছোটোকে স্নেহ করতেন। কারও কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সেই প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং আগন্তুককে সমাদর করতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী। সবচেয়ে উদার ও কোমল হৃদয় এবং সবচেয়ে মর্যাদাশীল বংশের অধিকারী। যে কেউ তাঁকে প্রথম বা হঠাৎ দেখত, তাঁর গাম্ভীর্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভয় পেয়ে যেত। যে তার সঙ্গে মিশত সে তাকে ভালোবেসে ফেলত। সওয়াবের আশা রয়েছে তিনি কেবল এমন বিষয়েই কথা বলতেন।

তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর মজলিশে উপবিষ্টরা এমন নিশ্চুপ হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি থামলে তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা বাদানুবাদ করতেন না। কেউ তাঁর মজলিশে বসে কথা বললে তার কথা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সবাই নিশ্চুপ হয়ে তার কথা শুনতেন। তাদের যে কারও কথা তাদের প্রথমজনের কথায় ন্যায়। কারও কথার মাঝে নবীজী কথা বলতেন না, যতক্ষণ না সে সত্যের সীমালঙ্ঘন করত। তিনি তখন তাকে নিষেধ করতেন কিংবা মজলিশ থেকে উঠে গিয়ে তাকে নিবৃত করতেন। তারা যাতে হাসতেন তিনিও তাতে হাসতেন। তারা যাতে বিস্মিত হতেন তিনিও তাতে বিস্মিত থেকেন। নবাগত ও অপরিচিত ব্যক্তি রুক্ষ ভাষায় কথা বললে এবং অভদ্রভাবে প্রার্থনা করলে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা পরমুখাপেক্ষী ও অভাবগ্রস্তকে দেখলে তার প্রয়োজন পূরণ করে দাও'।

আনাস (রা.) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জীর্ণ গদিতে এবং চার দিরহাম সমমূল্যের একটি চাদরে বসে হজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لَا سُمْعَةَ فِيْهَا وَ لَا رِيَاءَ،

'আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, আমরা এমন হজ করব, যাতে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, 'আমরা পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করলে নবীজীও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। আমরা আখেরাতের কথা আলোচন করলে তিনিও আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কারও সঙ্গে অপছন্দনীয় আচরণ করতেন না। মন্দ আচরণের প্রতিদানে মন্দ আচরণ করতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন এবং মুখে এর উল্লেখও করতেন না।'

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি। কোনো খাদেম বা কোনো নারীকেও কখনো প্রহার করেননি। অবশ্য আল্লহর পথে জিহাদ করতে গেলে ভিন্ন কথা। আমি তাকে ব্যক্তিগত কারণে কারও থেকে কখনো জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি। আল্লাহ তাআলার কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হলে তিনি সর্বাধিক ক্রুদ্ধ হতেন। দুটি বিষয়ের কোনা একটিকে গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে তিনি সব সময় গুনাহর কাজ না হলে সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন।'

আমিমাহ বিনতে রুকাইকা আনসারী (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন আনসারী মহিলার সঙ্গে আমি নবীজীর কাছে এলাম। আমরা তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা বায়আত হবো। আর বায়আত করতে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে হাত রাখতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন,

إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، قَدْ بَايَعْتُكُنَّ بِالْكَلَامِ.

'আমি মহিলাদের সঙ্গে মোসাফাহা করি না। একজন মাত্র মহিলাকে

বলা আমার কথা একশ জন মহিলাকে আমার বলা কথার সমান। আমি তোমাদের সকলকে কথার মাধ্যমে বায়আত করে নিলাম।'

আয়েশা (রা.) বলেন,

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ.

'আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনো কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের কেবল কথার মাধ্যমে বায়আত করতেন।'[৯৭]

মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস সূলামী (রা.) বলেন, 'একবার আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করছিলাম। হঠাৎ একজন লোক হাঁচি দিয়ে উঠলে আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বললাম, তখন সবাই অপছন্দের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগাল। আমি তা দেখে বললাম, আমার মাতা আমার বিয়োগ ব্যথায় কাতর হোক! কী ব্যাপার তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চায়। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষে আমাকে ডাকলেন। আমার পিতামাতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক! আমি তাঁর আগে বা পরে তাঁর চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে কোনো শিক্ষককে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে না ধমক দিলেন, না প্রহার করলেন আর না বকাঝকা করলেন; বরং বললেন, নামাজে মানুষ যে জাতীয় কথাবার্তা বলে এরূপ কিছু বলা উচিত নয়। প্রয়োজনবশত তাসবীহ, তাকবীর বা কুরআন পাঠ করতে হবে।'[৯৮]

---

[৯৭] সহীহ বুখারী : ৫২৮৮। সহীহ মুসলিম : ১৮৬৬।

[৯৮] সহীহ মুসলিম।

নবীজীর প্রতি আদব

আমাদের ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে সামান্য অবগতি লাভ করেছো। যাবতীয় মহৎ গুণাবলি ও উত্তম স্বভাব-চরিত্রের আধার ছিলেন তিনি। তাই আমরা আমাদের আচরণে-বিচরণে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে সর্বোত্তম আখলাক ও আদর্শ তাঁর কাছ থেকেই শিখব। নিজেদের সর্বসত্তা ও সর্বশক্তি একমাত্র তার নিরঙ্কুশ আনুগত্যে সঁপে দিব।

সেই সঙ্গে তুমি নবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের আচার-উচ্চারণ ও তাঁর সামনে তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করেছো। নবীজীর প্রতি আদব-এহতেরাম, ভক্তি-শ্রদ্ধায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর মজলিশে এমন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতেন যে, মনে হতো তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।

নবীজীর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আদব-এহতেরাম সম্পর্কে আমরা এখানে আরও আলোচনা করর।

প্রিয় নবীজীর প্রতি তাযিম ও তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধকে গুরুত্ব প্রদানের শীর্ষবিন্দুতে ছিল সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান। তিনি তাঁদের কোনো দায়িত্ব প্রদান করলে তাঁরা দ্রুত ছুটে গিয়ে তা পালন করতেন। তাঁর সামনে তারা কখনো উঁচু গলায় কথা বলতেন না। পরস্পরকে তাঁরা যেভাবে সম্বোধন করতেন, সেভাবে কখনো নবীজীকে সম্বোধন করতেন না। মানুষ গোপন কথা যেভাবে বলে, এমন ক্ষীণ আওয়াজে তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর মজলিশ থেকে উঠতেন না। তাঁর কথার আগে কেউ কথা বলতেন না। আগ বাড়িয়ে কিংবা তাঁর আদেশ ও নির্দেশনা ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতেন না।

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের এমন সমুচ্চ আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বনের প্রতিই পবিত্র কোরানে আহ্বান করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে আগ বেড়ে যেও না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন; সবকিছু জানেন। হে ঈমানদারগণ, নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে কথা বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সঙ্গে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে।'[৯৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

'রাসুলের আহবানকে তোমরা একে অপরকে আহবানের মতো গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে সুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরন করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।'[১০০]

সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.

'জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তাঁরাই এমন লোক যাদের অন্তর আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাঁদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার।'[১০১]

---

[৯৯] সূরা হুজুরাত : ১-২।
[১০০] সূরা নূর : ৬৩।
[১০১] সূরা হুজুরাত : ৩।

পবিত্র কোরানে আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে নবীজীর কাছে অনুমতি প্রার্থনার আদবও শিক্ষা দিয়েছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ.

'মুমিন তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং যখন রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত কোনো কাজে শরীক হয়, তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কোথাও যায় না।'[১০২]

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন কুরাইশরা যখন ওরওয়া ইবনে মাসুদ ছাকাফিকে (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালো। তিনি তখন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী পরিমাণ তাযিম ও সম্মান করেন, সে দৃশ্য সচক্ষে অবলোকন করলেন। সবাই দৌড়ে তাঁর অজুর পানি এগিয়ে দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত অজুর এক ফোঁটা পানিও তারা মাটিতে পড়তে দেন না। তিনি তাঁদের কোনো আদেশ করলে দ্রুত তারা তা পালনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কথা বলা শুরু করলে তাঁদের মাঝে পূর্ণ নীরবতা নেমে আসে। আদবের প্রাবল্যে কেউ তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান না। এসব দৃশ্য অবলোকন করে তিনি কুরাইশের কাছে গিয়ে বললেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنِّيْ جِئْتُ كِسْرَى فِيْ عَظْمَتِه، وَقَيصَرَ فِيْ سُلْطَانِه، وَالْنَّجَاشِيَّ فِيْ مُلْكِه، وَإِنِّيْ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِيْ قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِيْ أَصْحَابِه.

'হে কুরাইশ দল, আমি কিসরার মর্যাদা, কায়সারের ক্ষমতা, নাজ্জাসির রাজদরবার দেখেছি। আল্লাহর কসম! আমি কোনো রাজা-বাদশাহকে তাঁর কওমের কাছ থেকে এতটা সম্মান লাভ করতে দেখিনি যতটা মুহাম্মাদকে তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে লাভ করতে দেখেছি।'

[১০২] সূরা নূর : ৬২।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের এর চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্তের কথা তুমি যদি জানতে চাও, তাহলে নবীজীর চাচা বিখ্যাত সাহাবি হযরত আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত উত্তরটি শোনো; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন; 'আমি বড় নাকি আপনি?' তিনি বললেন, 'সম্মান ও মর্যাদায় আপনি বড়, আমি কেবল আপনার বয়সে বড়।'[১০৩]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যথাযথ তাযিম-এহতেরাম, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনম্রতা প্রদর্শনের এরূপ আরও অসংখ্য ঘটনা মানবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের মাঝে পাওয়া যায়। সেসব ঘটনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নবীজীর সঙ্গে আদব রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা কতটা সজাগ ও সচেতন ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র উদাসীনতা কিংবা ন্যুনতম অবহেলা ছিল না।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.)[১০৪] বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনে ইয়াকুব মাখযূমি (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়? আমি নাকি আপনি? তিনি বললেন, আপনি সম্মানে আমার চেয়ে বড় এবং আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমি আপনার বয়সে বড়।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আদব ও সম্মানের গুণটি তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ সচেতন ছিলেন। নবীজীর উপস্থিতিতে যেমন তেমনি তাঁর অনুপস্থিতিতে। তিনি কাছে থাকুন কিংবা দূরে, তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনে তাদের কোনো ত্রুটি হতো না।

বিখ্যাত সাহাবি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর ঘটনা, একবার তিনি কুবাচ ইবনে আশইয়াম কিনানি (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বড় নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তখন কুবাছ (রা.) বললেন, অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সর্বদিক থেকে) বড়। আমার জন্মটা কেবল তাঁর আগে হয়েছিল।'[১০৫]

---

[১০৩] আল্লামা সুয়ূতী (র.) কৃত তারিখুল খুলাফা : ২১।

[১০৪] আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ, ২: ৫১।

[১০৫] সুনানে তিরমিযী, মানাকিব অধ্যায় ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকুন কিংবা পবিত্র রওযায় শায়িত, সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং আদব বজায় রাখা প্রত্যেক মুসলামানের অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃত আদব ও শিষ্টাচার এটাই। প্রত্যেক মুসলমানের মাঝে এই গুণটি থাকা আবশ্যক।

তাছাড়া এটি একটি মহৎ চারিত্রিক গুণ, যা কোনো ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার কথা ঘোষণা করে। অন্তরে লালন করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার গভীরতা তুলে ধরে এবং তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার বিষয়টি প্রকাশ করে।

আমাদের পুণ্যাত্মা মহান পূর্ববর্তীগণ রাসূলে খোদার প্রতি আদব-এহতেরাম এবং সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাদের সেসব ঘটনা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি শিক্ষণীয়। নবীজীর প্রতি আদব-এহতেরাম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিস্ময়কর সেসব ঘটনার দুয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করব।

নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

আল্লামা কাজি ইয়াযের বর্ণনায়[১০৬] স্বর্ণোজ্জ্বল সেসব ঘটনার দুয়েকটি আমরা এখানে তুলে ধরছি।

'এক লোক একবার বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.)-এর কাছে এসে তাঁকে একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তখন শোয়া অবস্থায় ছিলেন। উঠে বসলেন, তারপর হাদিসটি বর্ণনা করলেন। লোকটি তখন তাঁকে বলল, আপনি কষ্ট করে না উঠলেও পারতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বললেন, আমার কাছে এটা অপছন্দনীয় যে, আমি শুয়ে শুয়ে তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করব।'

কাজি ইয়াজ (র.) বলেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব-এহতেরাম এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) সর্বদা অজুর হালতে হাদিস বর্ণনা করতেন। আমিরুল মুমিনীন আবু জাফর আল মানছূর যখন মসজিদে নববীতে তাঁর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়ে গলার আওয়াজ উঁচু করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, এই মসজিদে আওয়াজ উঁচু করবেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে আদব শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

'হে মুমিনগণ, নবীর আওয়াজের ওপর তোমরা তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না, এবং তোমাদের একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সঙ্গে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে

[১০৬] আশ-শিফা ২ : ৩৪-৩৫।

তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে, যা তোমরা টেরও পাবে না।'[১০৭]

একদল লোকের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.

'যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের আওয়াজ নিচু রাখে , আল্লাহ তাঁদের অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।'[১০৮]

আরেকদল লোকের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'যারা আপনাকে হুজরার বাইরে থেকে (উচ্চ স্বরে) ডাকে তাদের অধিকাংশেরই কোনো জ্ঞান নেই।'[১০৯]

ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্বোত্তম পন্থা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্বোত্তম পন্থা হলো, তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি দুরুদ পড়ে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর ফেরেশতারা নবীজীর প্রতি দুরুদ পড়েন। সুতরাং আমরাও যেন দুরুদ পড়ি। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের দুরুদ পড়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

'মহান আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীজীর প্রতি দুরুদ পড়ে। হে

---

[১০৭] সূরা হুজুরাত : ২।
[১০৮] সূরা হুজুরাত : ৩।
[১০৯] সূরা হুজুরাত : ৪।

ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরুদ ও সালাম পড়।'[১১০]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহান আল্লাহ এবং তাঁর নিষ্পাপ ফেরেশতাকুলের দুরুদ পড়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর প্রশংসা করা, স্তুতি গাওয়া, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করা, তাঁর আলোচনা ও খ্যাতিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অত্যুচ্চে তুলে ধরা। এর চেয়ে মর্যাদা কিংবা প্রশংসা আর কী হতে পারে!

এ বিষয়টি পাঠকের সামনে আরও সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে, যখন সে লক্ষ করবে যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে অন্য সকল নবীকে তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

'(হুকুম হলো হে নুহ,) আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকতসহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের উপর আমার নিদারুণ আযাব আপতিত হবে।'[১১১]

...قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

'... হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।'[১১২]

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ.

---

[১১০] সূরা আহযাব : ৫৬।

[১১১] সূরা হুদ : ৪৮।

[১১২] সূরা ছাফফাত, ১০৫।

'হে মূসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের ওপর আমার রেসালাত ও আমার সাথে 'কালাম' করার দ্বারা নির্বাচিত করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে (যা) দান করলাম, গ্রহণ কর, কৃতজ্ঞ থাকো।'[১১৩]

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, তুমি তোমার ওপর এবং তোমার মাতার ওপর বর্ষিত আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি।'[১১৪]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত কোরান শরীফে যতবার সম্বোধন করেছেন, একটিবারের জন্যও তিনি তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেননি।

'হে নবী', 'হে রাসূল'-ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

'হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[১১৫]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ.

'হে রাসূল, যারা কুফরীর দিকে ধাবিত হয়, তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না।'[১১৬]

অধিক সম্মান ও মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

---

[১১৩] সূরা আরাফ : ১৪৪।
[১১৪] সূরা মায়েদা : ১১০।
[১১৫] সূরা আহযাব : ৪৫।
[১১৬] সূরা মায়েদা : ৪১।

মহান আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা কর্তৃক নবীজীর প্রশংসা করা এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সম্বোধন করার বিষয়টি আমাদের আহ্বান কওে যে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন তাঁর প্রতি দুরুদ পাঠ করে নেই। তাহলে আমাদের মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হবে এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে আমাদের আমল মিলে যাবে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ পবিত্র কোরানে না থাকলেও তা আমাদের দায়িত্ব হিসেবে সাব্যস্ত হতো। অথচ এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এ থেকেই অনুমেয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের কী পরিমাণ দুরুদ পাঠ করা উচিত! আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

'আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীজীর প্রতি দুরুদ পড়ে। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরুদ ও সালাম পড়ো।'[১১৭]

তাছাড়া প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ধরে রাখা, তাঁর প্রতি আদব রক্ষা এবং তাঁর প্রশংসা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ও অন্যতম দায়িত্ব। কারণ, আমরা তাঁর বরকত লাভ করেছি। সে হিসেবে আমরা এর অধিক হকদারও। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের ভ্রষ্টতার ঘোর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে হেদায়াতের আলোকিত পথের দিশা দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

'হে মানুষ, তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল এসেছেন, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যে কোনো কষ্ট তাঁর জন্য

[১১৭] সূরা আহযাব : ৫৬।

বড় পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।'[১১৮]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাঁর প্রতি দুরুদ ও ছানা পড়ার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালাম পেশ করার পদ্ধতি তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার প্রতি দুরুদ কীভাবে পাঠ করব?'

তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قولوا: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

'তোমরা পড়বে, হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি জগদ্বাসীর মধ্যে ইবরাহিম আ এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি চির প্রশংসিত ও চির মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন। যেরূপ আপনি জগদবাসীর মধ্যে বরকত দান করেছেন ইবরাহিম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও অত্যন্ত মর্যাদাবান।'[১১৯]

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমি একটু মনোযোগর সঙ্গে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তরের মাঝে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, আমরা নবীজীর প্রতি যেভাবে দুরুদ পড়ি, সেভাবে আসলে দুরুদের হক যথাযথভাবে আদায় হয় না। অর্থাৎ আমরা যখন শুধু اللّٰهُمَّ صَلِّ

---

[১১৮] সূরা তাওবা : ১২৮।

[১১৯] সহীহ বুখারী : ৪৭৯৭। সহীহ মুসলিম : ৪০৬।

عَلَى مُحَمَّدٍ বলি, তখন আমাদের দুরুদ পড়া হয় না। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য দুরুদ পড়তে বলেছেন। কারণ, তিনিই তাঁর নবীর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা দুরুদ পড়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন, صَلُّوْا عَلَيْهِ। যেহেতু এ বাক্যের صَلُّوْا শব্দটি صَلَاة (সালাত) থেকে উদগত, তাই এর শাব্দিক অর্থ, তোমরা তাঁর প্রতি সালাত পড়ো। অথচ আমরা সকলেই জানি দুরুদ সালাত (নামাজ) নয়। তাহলে দুরুদের জন্য সালাত শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো?

আমরা এই বাক্যটির ভাষাগত সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারব, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরানে সালাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার দুরুদ পাঠের জন্যও সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেন তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠকে সালাতের মতো মহান শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য করছেন এবং আমাদের দুরুদ পাঠকে সালাত নামে আখ্যায়িত করছেন। এখানে আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম সালাতে যেমন বিরাট সওয়াব ও মহাপুরস্কার রয়েছে, তেমনি নবীজীর প্রতি দুরুদ পাঠেও বিরাট সওয়াব ও মহাপুরস্কার রয়েছে।

স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুরুদ পড়ার আদেশ করে বলেছেন, এতে বিরাট আজর ও সওয়াব এবং মহাপ্রতিদান রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা এবং আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরুদ পড়বে। আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন।'[১২০]

এ কারণেই হাদিস শরিফে দুরুদ পাঠে অবহেলাকারীকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১২০] সহীহ মুসলিম : ৪১২৮। সুনানে আবি দাউদ।

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

'ওই ব্যক্তি কৃপণ, যার সামনে আমার নাম স্মরণ করা হয় অথচ সে আমার ওপর দুরুদ পড়ে না।'[১২১]

এভাবে নিন্দা করার কারণ, সে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রসূনের প্রতি দুরুদ পড়তে কৃপণতা দেখিয়েছে, যাঁকে তার প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে এবং যিনি তার ওপর মহাঅনুগ্রহ করেছেন। সে নিজের প্রতিও কৃপণতা করেছে, দুরুদ না পড়ার কারণে নিজেকে সে মহান আল্লাহর দশটি রহমত থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এ দশটি রহমত সে মাত্র একবার দুরুদ পড়ার বিনিময়ে লাভ করতে পারত।

এতক্ষণ আমরা দুরুদের গুরুত্ব ও বিরাট ফযিলত সম্পর্কে জানলাম। এ থেকে আমরা ওই সকল ব্যক্তির ত্রুটি ও অপরাধের মাত্রাটা বুঝতে পারব, যারা বিশেষ কিংবা সাধারণ মজলিশ-মাহফিলে কোনোরূপ সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার কিংবা দুরুদ পাঠ ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বারংবার উচ্চারণ করে থাকে। অথচ অন্যান্য ব্যক্তিদের নাম অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে নিয়ে থাকে এবং প্রশংসার ফুলঝুড়ি ঝরিয়ে থাকে। বড় বড় উপাধি, বিরাট বিরাট বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অনেক সময় এসব উপাধি কিংবা বিশেষণের উপযুক্তও থাকে না। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সমস্ত মহান ব্যক্তির চেয়ে প্রশংসা ও সম্মানের অধিক উপযুক্ত।

একজন মুমিন তার অন্তরে মহান আল্লাহ তাআলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে কাউকে অধিক সম্মান ও মর্যাদার আসন দিতে পারে না। এটা তার জন্য অসমীচীন।

এতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক নষ্ট করা হয়।

---

[১২১] জামে তিরমিযী : ৩৫৪৬। মুসতাদরাকে হাকেম ১ : ৫৪৯। মুসনাদে আহমাদ ১ : ২০১। মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৬৭৭৬। ইমাম যাহাবী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পবিত্র ও মোবারক নাম নিব। নামের শুরতে সম্মানসূচক 'সাইয়েদুনা' শব্দ ব্যবহার করব এবং নামের শেষে দুরুদ পড়ব।[১২২]

কেউ অধিক পরিমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করলে, প্রশংসা ও সম্মানের সঙ্গে বারবার তাঁর নাম নিলে বোঝা যায়, তার অন্তর রাসূলে কারীমের মহব্বত ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। রাসূলের আনীত দীনের পবিত্রতার বোধ তার মাঝে জাগ্রত এবং সে সেই দীনের যাবতীয় হুকুম-আহকামের অনুসারী।

মানুষ যখন আদব-এহতেরামের সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করে, তখন তার অন্তরের গভীরে ঈমানের শিকড়গুলো প্রোথিত হয়ে যায়।

তার বাহ্যিক অবয়ব এবং আচরণ-বিচরণে ঈমানের বিভিন্ন আলামত ফুটে উঠে। প্রিয় নবীজীর আনীত পবিত্র দীন ও শরীয়তের বাস্তবায়ন এবং তাঁর মোবারক সুন্নতকে জিন্দা করার মনোবল তার মাঝে জেগে উঠে।

---

[১২২] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে 'সাইয়েদুনা' (আমাদের নেতা) বিশেষণ ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করে থাকেন। অথচ আমি এমন আপত্তির কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কুরআনে একজন নবীর ক্ষেত্রে এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। (দেখুন সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৩৯)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে বিশেষ নেয়ামত দান করবেন, তার উল্লেখ করে শাফায়াতের প্রসিদ্ধ হাদিসে 'সাইয়েদুনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমি আদম সন্তানদের নেতা এবং এতে গর্বের কিছু নেই। দেখুন শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (র.) কৃত 'মিন আদাবিল ইসলাম' নামক গ্রন্থেও ৯ পৃষ্ঠাটি। সেখানে তিনি এই শব্দটি ব্যবহারের বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কতিপয় মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। (শাইখ আবদুল মাজিদ বায়ানুনী)

আমাদের কর্তব্য

আমরা কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত তাযিম ও সম্মান প্রদর্শন করব? এর যথাযথ হক কীভাবে আদায় করব?

মুসলমানগণ মানবজাতির ওপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাঅনুগ্রহের কথা ভুলেনি। হিজরি প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা রাসূলে আরাবীর প্রতি সম্মান এবং তাঁর স্মরণে আলোকসজ্জা, মজলিশ-মাহফিল ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। পত্রিকাগুলোতে থাকে সীরাত বিষয়ক আকর্ষণীয় লেখা। নাতে রাসূলের সুরে সুরময় হয়ে ওঠে মুসলিম সমাজ। সকলের মনে প্রফুল্লতা ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাযিম ও সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব এভাবে কিছুটা পালন হয়।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ এবং তাঁর আলোচনাকে শুধু বিভিন্ন আলোকসজ্জা, সভা-সেমিনারের আয়োজন, পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশ এবং ওয়াজ-মাহফিলে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় । এসব কোনো কিছু তাঁর প্রতি তাযিম ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয় এবং এভাবে তাযিম ও সম্মানের প্রকৃত হকও আদায় হয় না।

প্রকৃত হক আদায় তখন হবে, যখন আমরা তাঁর স্মরণকে আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, উত্তম আখলাক, দৃঢ় ব্যক্তিত্ববোধ এবং সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জাগ্রত করব এবং নিজেদের আমরা এমন জাতি হিসেবে গড়ে তুলবো, যারা প্রকৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণ করবে, যে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ এবং ইসলামের বিশুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-ঐতিহ্য, যার সামনে গোটা পাশ্চাত্য সমাজ মাথানত করেছে এবং যার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের কাছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বড় বড় পণ্ডিতগণ নতি স্বীকার করেছে।

প্রকৃত তাযিম ও এহতেরাম তখন হবে, যখন আমরা তাঁর ওপর নাযিলকৃত পবিত্র কোরানকে আঁকড়ে ধরব এবং কোরানের মাঝেই যাবতীয় কল্যাণ, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও ব্যাখ্যা তালাশ করব। কোরানী আদর্শে নিজেদের রঙিন করব। কোরানের আলোয় আলোকিত হবো। পরিবার ও সমাজজীবনের সর্বস্তরে কোরানের আইন বাস্তবায়ন করব। কোরানে বর্ণিত প্রতিটি বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলব। কোনো প্রকার অবহেলা করব না, সীমালঙ্ঘনও করব

না।

সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত কোরান অধ্যয়ন করব। প্রতিটি আয়াত নিয়ে ভাবব, চিন্তা-ফিকির করব। কোরানের মাঝে যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধিবিধান রয়েছে, উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে–সেগুলো উদ্‌ঘাটন ও অনুধাবনের ঐকান্তিক চেষ্টা করব।

নবীজীর প্রতি প্রকৃত তাযিম ও সম্মান হলো, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা, তাঁর সীরাত তথা পবিত্র জীবনচরিত গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা এবং সেখান থেকে হেদায়াত, ইলম ও আমল, ত্যাগ ও কুরবানী, ইস্তেকামাত ও অবিচলতার শিক্ষা গ্রহণ করা। আর এগুলোর বাস্তব চিত্র আঁকা রয়েছে রাসূলের পরশধন্য এবং তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্ত মহান সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিমের জীবনের পরতে পরতে। গভীর অনুধাবনের সঙ্গে আমরা তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করলে জানতে ও শিখতে পারবো, কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হয়। কীভাবে দীন প্রতিষ্ঠায় ও সত্যের পতাকা উড্ডীনে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয়। কীভাবে আল্লাহর রাস্তায় রাসূলের আনীত দীনকে ও তাঁর আদর্শকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নিজের জান-মাল কুরবান করতে হয়, সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হয়।

আমাদের আমলী ও আখলাকী জীবন, আমাদের প্রাত্যহিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, এ সকল বিষয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শের মাঝে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

রয়েছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন কোন আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলা উচিত, একটি জাতির শাসক ও জনগণকে কোন বিধান মেনে চলা উচিত, সেসবের সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং জীবন চলার পথে আমরা যেসব জটিলতা ও বাধার সম্মুখীন হই, সেগুলোর নিরসন ও সমাধান।

রাসূলে আরাবীর সুন্নত এবং তাঁর মহান সাহাবায়ে কেরামের সীরাত হচ্ছে এমন আলোকমশাল, যা সত্যকে আমাদের সামনে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরে এবং আমাদের সঠিক পথের দিশা দান করে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত তাযিম ও সম্মান প্রদর্শন

করতে হলে আমাদের ইসলামী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে এবং তাঁর শাশ্বত ও চিরন্তন জীবনবিধানকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এ এমন এক ঐশী বিধান, যা একজন ব্যক্তিকে উত্তম চরিত্র, গভীর জ্ঞান, সার্বক্ষণিক জিহাদী চেতনা এবং সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করে গড়ে তোলে।

তখন কোনোকিছু তাকে টলাতে পারে না।

বাতিলের রক্তচক্ষুকে সে ভয় পায় না।

পার্থিব কোনো লোভ-লালসায় লালায়িত হয় না।

প্রবৃত্তির প্রবল ঝড় তাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না।

পারে না কোনো গোত্র ও সম্প্রদায়প্রীতি কিংবা জাতীয়তাবাদ তাকে আদর্শচ্যুত করতে।

সে হক ও ন্যায়ের পক্ষে লড়ে এবং এ ব্যাপারে সে আপসহীন থাকে, কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পায় না।

সত্যের সংগ্রামে সে সদা আগুয়ান এবং এ পথেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করে সে হয় মহীয়ান।

প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন তখন হবে, যখন মুসলিম যুবক তাঁর গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অতীত ও পুণ্যবান মহান ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গৌরববোধ করবে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

মুসলিম উম্মাহর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং তাদের জাগৃতির লক্ষ্যে ইতিহাস গড়া মহাবীর ও কীর্তিমান মনীষীদের মতো আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কর্মের ময়দানে এগিয়ে যাবে।

ইতিহাসের পাতায় গর্ব ও গৌরব, সম্মান ও মর্যাদার অমর কীর্তি সে নিজেও রচনা করবে।

সে এমন দীনের অনুসারী হওয়ার অহংবোধ নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যে দীন মানবতাকে মূর্খতার অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে জ্ঞানের আলোকিত রাজপথের দিশা দিয়েছে। দূর করেছে জাহেলিয়াত ও কুসংস্কারের ঘোর অমানিশা এবং মানবতাকে দিয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও চিরসুন্দর সভ্যতার দিশা।

পবিত্র কোরানে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

'ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে। আর বলে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।'[১২৩]

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমাদের আহ্বান, তারা যেন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে তাঁর পথে ফিরে আসার এবং নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তি ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের তৌফিক দান করেন।

নিশ্চয় তিনি অধিক সম্মানীত দাতা এবং দ্রুত ডাকে সাড়া দানকারী।

[১২৩] সূরা ফুসসিলাত : ৩৩।

যে ছবি যায়না আঁকা

মূল

আবদুল মাজিদ বিন আসআদ বায়ানূনী

ভাষান্তর

যায়েদ আলতাফ

আলেম, লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম সৃষ্টিকুলের সেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। তাঁর সমস্ত সাহাবি, অনুসারী এবং প্রিয় উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন।

হামদ ও সালাতের পর, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত তথা পবিত্র জীবন মোবারক সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক যা তাঁর প্রতি মহব্বত এবং তাঁর অনুপম আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণের প্রেরণা সৃষ্টি করে। এটি মুসলমানদের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস।

সীরাতের জ্ঞান একজন মুসলিমের দীন ও আখলাক হেফাজত করে। তখন সে কারও অন্ধ অনুসরণ করে না কিংবা কোনো ভ্রষ্টতার পথ ধরে না।

বর্তমানে মুসলিম তরুণ ও যুবসমাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও তাঁর অনুপম আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই অজ্ঞতা এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ের যে, তাদের কাউকে প্রিয় নবীজী সম্পর্কে লিখতে বলা হলে তার জ্ঞানের দৌড় এক পৃষ্ঠাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর এই এক পৃষ্ঠারও কম লেখায় অনেক সময় সঠিকের চেয়ে ভুলের পরিমাণ বেশি থাকবে। কখনো কখনো সে এমন বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা লিখে বসবে, যা হাস্যকর এবং একই সঙ্গে দুঃখজনক।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তার মাত্র কয়েক লাইনের জানাশোনা। অথচ এর চেয়ে বহুগুণ জানাশোনা হালের অশ্লীল বিনোদন আর ক্রীড়াজগতের 'তারকাদের' সম্পর্কে। শুধু দেশীয় তারকাই নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অমুসলিম 'তারকাদের' সম্পর্কেও সে কী না জানে! তাদের অনেকের হাড়ির খবরও তার জানা!

আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের এই দৈন্যতা কিছুটা হলেও ঘোচাবার উদ্দেশ্যে আমি তাই একটি সংক্ষিপ্ত সীরাত রচনা করার চিন্তা করলাম। এর মাধ্যমে মুসলিম তরুণ ও যুবসমাজ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্পর্কে সামান্য পরিচয় লাভ করবে। জানতে পারবে; মানবজাতির জন্য নবীজীর আগমন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত ছিল!

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

'অবশ্যই তিনি মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক জনকে রাসূল কওে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন। তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন। তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন, যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।'[১২৪]

আমি এই আশায় পুস্তিকাটি রচনা করেছি, হয়তো এটি পড়ে আমাদের সন্তানদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনচরিত আরও বিস্তারিত জানার আগ্রহ তৈরি হবে। নবীজীর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর আদর্শ অনুসরণের অভিলাষ নিয়ে তারা তখন তাঁকে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে। আর একজন মুমিনের সীরাত অধ্যয়ন তো এমনই হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে সমস্ত ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে কথায় ও কাজে ইখলাসের দৌলত দান করেন। এই কাজটি একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের উপকৃত করেন। আমার আমলনামায় এর সওয়াব দান করে পরকালের সঞ্চিত ধন হিসেবে একে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখেন। নিশ্চয় তিনি অতি মহান দাতা। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।

-আবদুল মাজিদ বিন আসআদ বায়ানূনী

[১২৪] সূরা আলে ইমরান : ১৬৪।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব

প্রিয় পাঠক, আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তোমাকে, আমাদের উভয়কে তৌফিক দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যত দিক নিয়ে মানুষ আলোচনা ও গবেষণা করুক- এগুলোর মূলে হচ্ছে তাঁর সেই মহান চরিত্রমাধুর্য, সৃষ্টিগতভাবে তিনি যার বাহক ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা যা তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিণত করেছিলেন।

মহান আল্লাহ যে তাঁকে বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আদম সন্তানদের সর্দার বানিয়েছিলেন, সেদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরানে তিনি বলেন,

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ.

'আর যখন তাদের (মক্কাবাসীদের) কাছে কোনো নিদর্শন আসত তখন তারা বলত, আল্লাহর রাসূলগণকে যা কিছু দান করা হয়েছে,অনুরূপ আমাদেরও যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। অথচ আল্লাহ তাআলা জানেন, তিনি তাঁর রেসালাত কার ওপর ন্যস্ত করবেন। যারা এ জাতীয় অন্যায় উক্তি করেছে তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর কাছে গিয়ে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।'[১২৫]

এই আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র একটি হাদিসে আরও সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। হাদিসটি মুত্তালিব ইবনে আব্দুল ওদায়া (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতিপয় লোকের করা কিছু মন্তব্য পৌঁছল। আব্বাস (রা.) বলেন, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন,

مَنْ أَنَا؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ

[১২৫] সূরা আনআম : ১২৪।

فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

'হে লোকসকল, আমি কে? তারা বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের দুটি দলে ভাগ করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উত্তম দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর উত্তম গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি পরিবার ও ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম।'[১২৬]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মহত্ত্ব তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য এবং অনুপম চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে উজ্জ্বলরূপে ফুটে ওঠে। এর আলোকবিভায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়। আমরা তাঁর আনীত মহান দীন ও দীনের শিক্ষা, তাঁর সমুচ্চ মূল্যবোধ, মহৎ কীর্তি এবং মানবজাতির মাঝে তাঁর সাধিত বিশাল পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ করলেই এ বিষয়টি সুন্দররূপে বুঝতে পারবো।

আর তখন তাঁর সম্পর্কে আমাদের পূর্ণপ্রত্যয়, দৃঢ় সততা এবং অসীম নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে যে, তিনি অবশ্যই সমগ্র মানবজাতিকে তাঁর রবের অনুগ্রহে যাবতীয় অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমনিভাবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন মানবজাতির জন্য নেতৃত্বগুণসম্পন্ন সৎ, যোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ একটি মানবকাফেলা গড়ে তুলতে, মুহাম্মাদি পরশধন্য যে কাফেলার প্রতিটি সদস্য ছিলেন আকাশের তারকাতুল্য। যারা মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করেছিলেন। তাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন এবং এমন অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন, বহু শতাব্দিকাল মানবজাতি যার সুফল করেছে।

---

[১২৬] জামে তিরমিযী : ৩৪৫৫, ৩৫৪১। মুসনাদে আহমাদ : ২৪১৩৯।

পূর্ণতা ও সৌন্দর্য

মানবজাতির মাঝে পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের গুণ দুপ্রকারের হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার : পার্থিবজীবন সংশ্লিষ্ট। এ গুণগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষ অক্ষম। এটি তার সাধ্যাতিত বিষয়। মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে কাউকে দান না করলে এক্ষেত্রে কোনো ইচ্ছাধিকার ও ক্ষমতা নেই। যেমন, দৈহিক অবয়বের পূর্ণতা ও কমনীয়তা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা ও ত্রুটিহীনতা, চিন্তা-বোধ ও বাকশক্তি, বংশ মর্যাদা এবং পারিবারিক আভিজাত্য ইত্যাদি।

এই গুণগুলোর ওপর দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্ম নির্ভরশীল। যেমন : আহার-নিদ্রা, ঘর-সংসার, বসবাস, আয়-রোজগার, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি। জন্মগতভাবে দৈহিক কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে কিংবা শারীরিকভাবে পূর্ণ সুস্থ না হলে দৈনন্দিন জীবনের এ সকল প্রয়োজন পূরণ ব্যহত হয়।

আর পার্থিবজীবনের প্রয়োজনীয় এ সকল কর্ম দ্বিতীয় প্রকার তথা ধর্মীয় গুণ বলে বিবেচিত হবে, যদি এসব পূরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তাকওয়া অর্জন এবং আখেরাতের পাথেয় ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে দৈহিক শক্তি লাভ করা। তখন এসব জৈবিক কর্ম শরীয়ত অনুযায়ী হবে এবং প্রয়োজনের সীমারেখার মাঝে থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার : দীনী ও ধর্মীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট। এ গুণগুলো অর্জনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে এবং সকলের প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে। তাই এগুলোকে দীনী ও ধর্মীয় গুণ বলা হয়। যেমন, তাকওয়া ও পরহেযগারী, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়নতা, সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা, ক্ষমা ও সাহসিকতা, লজ্জা ও আত্মমর্যাদা, নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা ইত্যাদি।

এই গুণগুলো অনেকের মাঝে সত্তাগতভাবে বিদ্যমান থাকে। আবার অনেকের মাঝে থাকে না। এগুলো অনেকের স্বভাবজাত হয়ে থাকে, আবার অনেকের হয় না। তবে কেউ চাইলে চেষ্টা-সাধনা, নিয়মিত অনুশীলন এবং সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিদের সাহচর্যের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে।

পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের যেসব গুণের কথা উল্লেখ করা হলো- এগুলোসহ আরও

যেগুলো রয়েছে, কোনো মানুষের মাঝে এসব গুণের একটি বা দুটিও যথেষ্টরূপে উপস্থিত থাকলে সে সকলের মাঝে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। অনন্য ও শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তাহলে যে মানুষটির পবিত্র ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণতা অর্জনের এ উভয় প্রকার গুণের এমন মহাসমাবেশ ঘটেছিল, যা গণনা করা এবং যা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব, এককথায় সংখ্যাতীত ও বর্ণনাতীত, সেই সঙ্গে সন্নিবেশ ঘটেছিল এমন অনেক অনন্য বৈশিষ্ট্যের যা মানবপ্রচেষ্টার জোরে অর্জন করা সম্ভব নয়, এককথায় মানবসাধ্যাতীত–সেই মহামানবের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? কল্পনা করতে পারো!

তবে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো বান্দাকে পূর্ণতা অর্জনের এ সকল গুণ বিশেষভাবে দান করতে চাইলে তার পক্ষে এগুলো অর্জন করা সম্ভব। যেমনটি তিনি আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছিলেন। তিনি তাঁকে এ উভয় প্রকার গুণের পাশাপাশি কুদরতিভাবে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। যেমন, নবুয়ত, রেসালাত, আল্লাহ তাআলার সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও মহব্বত, খতমে নবুয়ত, বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরণ, শাফায়াতের অধিকার প্রদান, বক্ষ উন্মোচন, মানসিক দুঃখ-যাতনার ভার লাঘব, তাঁর আলোচনাকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা, বিজয়ের মর্যাদা দান, দোআ কবুল করা, প্রার্থিত বস্তু দান করা, নেয়ামত পূর্ণ করা, সাকিনা নামক বিশেষ রহমত অবতরণ, ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্যকরণ, কিতাব-হেকমত-সূরা ফাতেহা এবং পবিত্র কোরান দান, মুজিযার মাধ্যমে নবুয়তকে শক্তিশালী করা, আঙুলসমূহের মধ্য থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করা, খাবারে বরকত দান, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মেরাজ তথা উর্ধ্বজগত ভ্রমণ, মানুষের অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

মোটকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদায় সকলের উর্ধ্বে ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক গুণে সকলের চেয়ে অনন্য ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর আলোচনাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

দৈহিক সৌন্দর্য

হযরত আলী (রা.)-এর পৌত্র ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত হাদিসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠনের বর্ণনা এভাবে এসেছে, তিনি বলেন,

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহাবয়বের বর্ণনায় বলেন,

لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغَطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ، كَانَ جَعْدَ الشَّعْرِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا الْمُكَلْثَمِ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدَ ذَا مَسْرُبَةٍ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدَ النَّاسِ كَفًّا وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না এবং অত্যন্ত বেঁটেও ছিলেন না; বরং মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না; বরং কিছুটা ঢেউ খেলানো ছিল। স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন না। মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকার ছিল না; বরং কিছুটা গোলাকার ছিল। গায়ের রং ছিল সাদা-লাল মিশ্রিত গৌরবর্ণের। লম্বা ভ্রুযুক্ত গাঢ় কালো চোখের অধিকারী। তাঁর জোড়ার হাড়গুলো ছিল মোটা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানও মোটা এবং মাংসল ছিল। দেহে অতিরিক্ত পশম ছিল না। বুক থেকে নাভী পর্যন্ত হালকা পশমের রেখা ছিল। হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে ভরা। দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন। যেন কোনো ঢালবিশিষ্ট স্থান

থেকে (নিচ সমতলে) নামছেন। কারও দিকে ফিরে তাকালে পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন। উভয় স্কন্ধের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুয়ত। তিনি ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবী। সবচেয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ও স্বতঃস্ফূর্ত দানশীল। সর্বাধিক সত্যভাষী। কোমল হৃদয় এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী। কেউ তাকে হঠাৎ (প্রথম) দেখলে (তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের কারণে) ভয় পেয়ে যেত। যে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতো, তাঁর সঙ্গে মিশত, সে তাঁকে ভালোবেসে ফেলত। তাঁর দেহাবয়বের বর্ণনাকারী পরিশেষে এটা বলতে বাধ্য হতো, তাঁর আগে বা পড়ে তাঁর তুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি।

আবু জাফর বলেন, আসমায়ীকে আমি নবীজীর দেহাবয়বের বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বিশ্লেষণে বলতে শুনেছি;

الْمُمَغَّطِ : অত্যন্ত দীর্ঘ। জনৈক মরুবাসী আরবকে আমি বলতে শুনেছি,

تَمَغَّطَ فِيْ نَشَابَةٍ : অর্থাৎ তীরটি খুব জোরে টানল।

الْمُتَرَدِّدُ : খর্বকায় হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি আরেকটির মধ্যে যেন প্রবিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ছিলেন না।

القَطَطُ : অত্যন্ত ঘন কুঞ্চিত। الرَّجِلُ : ঈষৎ কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট। الْمُطَهَّمُ: মোটা, অত্যন্ত মাংসল। الْمُكَلْثَمُ: গোলাকার চেহারাবিশিষ্ট।الْمُشْرَبُ : লোহিতাভ শুভ্র কপাল। الأَدْعَجُ : ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট।الأَهْدَبُ : লম্বা পাপড়িবিশিষ্ট। الْكَتِدُ : দুই কাঁধের সংযুক্তিস্থল। একে আল-কাহিলও বলা হয়। الْمَسْرُبَة : বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ বাঁশের ছিলার মতো সরু লোম রেখা। الشَّثِن : হাত ও পায়ের আঙুল মাংসল হওয়া। التَّقَلُّع : দৃঢ় পদে চলা।

الصَّبَب: নিচু অঞ্চল। আমরা বলি, انْحَدَرْنَا فِيْ صَبُوبٍ وَصَبَبٍ: আমরা নিম্নাঞ্চলে নেমে এলাম।

العِشْرَة: সঙ্গ, একসঙ্গে উঠাবসা। العَشِيْرَة : সঙ্গী।

الْبَدِيْهَة : হঠাৎ, প্রথমবার। বলা হয়, بَدَهْتُهُ بِأَمْرٍ: বিষয়টি নিয়ে আমি তার কাছে হঠাৎ উপস্থিত হলাম। (তিরমিযী।)

নাফে বিন জুবাইর বিন মুতইম (রা.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর দুই হাতের তালু ও পায়ের তলা ছিল মাংসল। মাথা ছিল বড়, অস্থিগ্রন্থিগুলো ছিল মোটা। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ একটি সরু পশমের রেখা ছিল। হাঁটার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতেন। মনে হতো ওপর থেকে নিচের দিকে নামছেন। আমি তাঁর আগে এবং পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। [তিরমিযী]

রাবিয়া ইবনে আব্দুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বেশি লম্বা ছিলেন, না বেশি খর্বাকৃতির ছিলেন। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না। আবার বেশি তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না; (বরং ঈষৎ কোকড়ানো ছিল।) চল্লিশবছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাকে নবুয়ত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন।[১২৭] আল্লাহ তাআলা তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেন।[১২৮]

---

[১২৭] এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসূলের নবুয়ত পরবর্তী জীবনকাল ছিল বিশ বছর। মক্কায় দশ এবং মদিনায় দশ। অথচ আমরা জানি যে, নবুয়ত পরবর্তী জীবনকাল হচ্ছে তেইশ বছর। মক্কায় তেরো এবং মদীনায় দশ। এর নিরসনকল্পে মুহাদ্দিসগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত ও এর তিন বছর পর রেসালাত লাভ করেন। রেসালাত লাভের পর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। আলোচ্য হাদিসে নবুয়ত ও রেসালাতের মধ্যবর্তী তিন বছর সময় বাদ দিয়ে রেসালাত লাভের সময় থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[১২৮] হাদিসে উল্লিখিত হযরত আনাস (রা.)-এর এ কথাটি থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ুষ্কাল ছিল ষাট বছর। অথচ আমরা জানি যে, তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৬৩ বছর। এর নিরসনকল্পে মুহাদ্দিসগণ বলেন, কোনো কোনো ভাষায় সংখ্যাতত্ত্বে একক সংখ্যাগুলো গণনা করা হয় না। তাই হযরত আনাস (রা.) একক সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে শুধু দশকের সংখ্যার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। ষাটের পরের একক সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন। (অনুবাদক)

তখন তাঁর মাথায় ও দাঁড়ির পাকা চুলের সংখ্যা বিশটিরও কম ছিল।[১২৯]

সব সময় মৃদু হাসি লেগে থাকত তাঁর ওষ্ঠাধরে। অর্থবহ সুস্পষ্ট কথা বলতেন। সেই কথায় কোনো বাহুল্য থাকত না। কথা বললে মনে হতো, দন্ত মুবারকের মাঝ থেকে নূর ঠিকরে বের হচ্ছে।[১৩০]

সুন্দরতম মুখাবয়ব ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। তুমি তাঁকে দেখলে মনে হতো দীপ্তিমান সূর্যকে দেখছো।

আনন্দিত হলে চেহারায় এমন আলো ঝলমল করে উঠত যে, মনে হতো যেন এক টুকরো চাঁদ।[১৩১]

বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রিয় নবীজীর সৌন্দর্যের চিত্র এঁকেছেন এভাবে,

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لِنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো মানুষ জীবনে দেখিনি। তাঁর চেহারা মোবারক দেখে মনে হতো, দ্বিপ্রহরের দীপ্তিমান সূর্য তাতে সন্তরণ করছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে কাউকে চলতেও দেখিনি। যেন জমিন তাঁর জন্য গুটানো হতো। তিনি স্বাভাবিকভাবে পথ চলতেন। কিন্তু আমরা অতি কষ্টে তার নাগাল পেতাম।'[১৩২]

---

[১২৯] সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস : ৫৪৪৯; কিতাবুল মানাকিব : ৩২৮৪,৩২৮৫। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল: ৪৩৩০। তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব : ৩৫৫৬। মুসনাদে আহমাদ : ১৩০৩১। মুয়াত্তা মালেক : ১৪৩৪।

[১৩০] ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন : ... তিনি কথা বললে সামনের দাঁত দুটির মাঝখান থেকে আলোর দ্যুতি ছড়াত। (শামায়েলে তিরমিযী ১ : ২৭৫। শারহুস সুন্নাহ লিল-বাগাভী ১৩ : ২২৩।)

[১৩১] হযরত কাব ইবনে মালিক রা বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হলে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠত, যেন এক টুকরা চাঁদ। সহীহ বুখারী : ৩৫৫৬।

[১৩২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৬ : ১৭। জামে তিরমিযী : ৩৬৪৮। দালায়িলুন নাবুওয়াহ লিল-বায়হাকী ১ : ২০৯। সহীহ ইবনে হিব্বান : ২১১৮।

আলী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবরণ দেওয়ার সময় বলতেন, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলতেন, যেন কোনো উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন। কিংবা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোনো উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন। যখন চুপ থাকতেন, ভাবগাম্ভীর্য বিরাজ করত তাঁর মাঝে। যখন কথা বলতেন তখন এক অপার্থিব সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ত। দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হতো সবচেয়ে সুদর্শন ও পৌরুষদীপ্ত। কাছ থেকে দেখলে মনে হতো সবচেয়ে সুন্দর, মিষ্টি ও লাবন্যময়। মিষ্টভাষী। অতি স্বল্পভাষীও নন আবার অধিক আলাপীও নন। তাঁর কথামালা যেন একত্রে গাঁথা মালার মুক্তার দানাসমূহ, যা একটি একটি করে টপ টপ করে পড়ছে।

কারও দিকে ফিরে তাকালে গোটা দেহ মোবারক ঘুরিয়ে তাকাতেন। (শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলতেন না। কারণ এভাবে অন্যের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়) সবচেয়ে দানশীল, সবচেয়ে সাহসী, বাক্যালাপে সত্যবাদী, অধিক দায়িত্বশীল, কোমল স্বভাবের অধিকারী ও সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন। হঠাৎ কেউ তাকে দেখলে (তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের কারণে) ভয় পেয়ে যেত। কেউ ঘনিষ্টভাবে তার সঙ্গে মিশলে সে তাকে ভালোবেসে ফেলত। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারী তাঁর সম্পর্কে বলতে বাধ্য হতো,

لَمْ أَرَ قَبْلَه وَلَا بَعْدَه مِثْلَه.

'আমি তাঁর আগে ও পরে তাঁর তুল্য আর কাউকে দেখিনি।'

'আল-আমিন' উপাধি লাভের বিশ্লেষণ

মানবিক গুণাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে আমানতাদারী। সকল প্রশংসনীয় গুণের মিলনস্থলও এটি। এর উপাদান হচ্ছে, বিশুদ্ধ নির্মল স্বভাব-প্রকৃতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভারসাম্যপূর্ণ অনন্য ব্যক্তিত্ব, সচ্চরিত্রতা, পার্থিব মোহমুক্ততা এবং তুচ্ছ বিষয়-বিমুখতা ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য কুরাইশের গণ্যমান্য ও জ্ঞানীগুণী সকলেই দিয়েছিলেন। তাঁর নবুয়তের আগেই দ্বিধাহীন চিত্তে তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। আর নবুয়ত লাভের পর স্বয়ং কোরান তাঁর মহান চরিত্রের সাক্ষ্যদান করেছিল।

কুরাইশরা এতিম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে কেন সততা ও বিশ্বস্ততার এত বড় সনদ প্রদান করেছিল? তাদের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে এর উপযুক্ত কেউ কি ছিল না? নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

কুরাইশের সাক্ষ্যদানের এ বিষয়টি আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব।

প্রথম দৃষ্টিকোণ : কুরাইশরা যে কারণে সাক্ষ্যপ্রদানে বাধ্য হয়েছিল, তা হচ্ছে নবীজীর মাঝে আমানতদারিতার সামগ্রিক উপস্থিতি। তাঁর ব্যক্তিত্বে, আচরণে-বিচরণে, জীবনের সকল অঙ্গনে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার গুণটি দিবালোকের মতো এমন সমুজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছিল, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাদের সীমাহীন বিস্ময়ে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে আমানতদারীর গুণটি তার প্রকৃত স্বরূপ, মর্ম ও তত্ত্ব নিয়ে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব এক অলৌকিক মানবীয় রূপে গড়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য অতুলনীয়। মানবকুলের আর কারও মাঝে আমানদারীর এমন সামগ্রিকরূপ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

উপরন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন, বড় হয়েছিলেন, সে সমাজ ছিল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। সে সমাজের মানুষ ছিল জ্ঞান ও সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের মাঝে আমানতদারির সামান্য উপস্থিতি ছিল। এর প্রকৃত রূপ ও সামগ্রিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তারা কখনোই পরিচিত ছিল না। এটি প্রথম তারা লাভ করে এতিম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন মোবারক থেকে। তারা যদি তাঁর মাঝে আমানতদারীর এমন সামগ্রিক উপস্থিতি লক্ষ না করতো, এর প্রকৃত রূপ দেখতে না পেতো, তাহলে তারা কখনোই তাকে 'আল-আমিন' স্বীকৃতি দিত না। কিংবা দিলেও তা তখন উল্লেখযোগ্য কিছু হতো এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের বিভায় বিকশিত হতো না। অথচ আমানতদারী তাঁর অনুপম চরিত্রের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এবং আলোকিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ : কুরাইশরা যখন প্রিয় নবীজীকে 'আল-আমিন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তখন তিনি যুবকবয়সি ছিলেন। আর যুবকবয়সটা হচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক সময়। কারণ, এ সময় মানুষের মাঝে প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল থাকে। শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন ধরনের চাহিদার প্রতি আসক্তি থাকে। আর সেসব চাহিদা পূরণে শরীরে পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমতা থাকে। এই শক্তি ও উদ্যমতাই তাকে প্রবৃত্তির অতৃপ্ত বাসনা পূরণে চরম সীমালঙ্ঘন ও লজ্জার সকল পর্দা ছিন্ন করতে প্ররোচিত করে থাকে।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনের এমন ঝুঁকিপূর্ণ ও নাযুকতম সময়েও চারিত্রিক পবিত্রতা, সততা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। রেসালাতের মহান মুকুট ধারণ করার আগে, জীবনের দীর্ঘ চল্লিশটি বছরে এক মুহূর্তের জন্য তিনি তা থেকে বিচ্যুত হননি। কুরাইশরাও তাঁর এমন কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি যা তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রে সামান্য দাগ কাটতে পারে। তাই নবুয়ত পরবর্তী সময়ে কুরাইশরা ঘোর দুশমনে পরিণত হয়েও তাঁর 'আল-আমিন' উপাধি ছিনিয়ে নিতে পারেনি। যেমনিভাবে তারা পারেনি তাঁর পরিবর্তে তাদের কোনো সরদারকে এই উপাধিতে ভূষিত করতে।

আল্লাহ তাআলা নবীজীর, নবুয়তের জীবনের আগে ও পরে, নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য কুরাইশদের কাছ থেকে আদায় করেছেন। কুরাইশদের প্রদানকৃত এই সাক্ষ্যই তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ। কারণ, ঘোর বিরোধী ও চরম শত্রুর দেওয়া সাক্ষ্য সব সময় শক্তিশালী হয় এবং অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সন্দেহবাদীদের তখন সন্দেহ পোষণ করার আর কোনো অবকাশ থাকে না।

সেই সঙ্গে কুরাইশদের এই সাক্ষ্য প্রদান এ কথারও প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার গুণটি ছিল

তাঁর পবিত্র সত্তাগত ও স্বভাবগত। আল্লাহ তাআলা মানবকুলের মাঝে তাঁকে এমন বিশুদ্ধ নির্মল স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন যা ছিল সমস্ত মানবীয় গুণ-গরিমা ও পূর্ণতার আধার।

***

এমন অনন্য অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধ নির্মল স্বভাব-প্রকৃতির গুণে তিনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সমাজের কোনো পাপ ও অন্যায় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রকৃত বিষয় হলো, সমাজ ও পরিবেশের পক্ষে কি সম্ভব সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে প্রভাবিত করা? সম্ভব নয়। তাঁর মতো মহামানব তো প্রভাবক হয়ে থাকেন, প্রভাবিত নন; যিনি সমাজ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকেন, নিজে প্রভাবিত হন না। সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতি, মন্দ আচার ও রীতিনীতি-এগুলোর সঙ্গে লড়াই করে একসময় এগুলোর ওপর জয়লাভ করেন। ব্যক্তিত্বের যাবতীয় মহৎ গুণাবলির সাথে সেগুলো একীভূত করে নিজের অনুপম চরিত্রের সুষমা মেখে দেন এবং সমাজ ও সমাজের মানুষকে নিজস্ব আদর্শ ও চেতনা অনুযায়ী পরিচালিত করেন।

সাদ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়েশা (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাকে আল্লাহর রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে বলুন। তখন তিনি বলেন, তাঁর চরিত্র ছিল কোরান।'[১৩৩]

সাদ ইবনে হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়েশা (রা.)-এর কাছে এসে বললাম, উম্মুল মুমিনীন, আপনি আমাকে আল্লাহর রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিন। তখন তিনি বলেন, তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র কোরান। তুমি কি কোরানে মহান আল্লাহ তাআলার এই আয়াতটি পড়োনি?

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

(আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।)[১৩৪] আমি বললাম, আমি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করতে চাই। তিনি বললেন, এমনটি করো না। তুমি কি এই আয়াত তেলাওয়াত করো না?'

---

[১৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ২৪১৩৯

[১৩৪] সূরা কলম : ৪।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

'অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর তা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ এবং আখেরাতের প্রত্যাশা করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।[১৩৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়েও করেছেন আর তাঁর সন্তানও হয়েছে।'[১৩৬]

কুরাইশরা এমন কোনো যুবককে কি চিনতো, যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর চেয়ে পূতপবিত্র এবং পুণ্যবান, যে তাঁর চেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশ, অভিজাত পরিবার এবং মহান চরিত্রের অধিকারী?

তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে 'আল-আমিন'(পরম বিশ্বস্ত) উপাধি দিয়েছিল। এ বিষয়ে তাদের কোনো দ্বিমত ছিল না। নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য সকলের সম্মতি ছিল। তাদের কোনো সরদারকে তারা 'আল-আমিন' উপাধি লাভের যোগ্য মনে করলে তারা মুহাম্মাদকে–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এমন উপাধিতে ভূষিত করতে কার্পণ্য করতো। শুধু তাঁকেই বিশেষভাবে এই নামে অভিহিত করতে তারা ঘোর আপত্তি জানাতো।

খাদিজা (রা.) ছিলেন প্রজ্ঞার অধিকারিনী বুদ্ধিমতি মহীয়সী নারী। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পনেরো বছর ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি নবীজীর ব্যক্তিত্ব, আখলাক-চরিত্র খুব গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নবুয়ত লাভের সময় হেরা গুহায় ওহি অবতরণ হলো। ঘটনার আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতায় নবীজী ভয় পেয়ে গেলেন। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। দ্রুত ঘরে ফিরে এসে খাদিজা (রা.)-কে সব খুলে বললেন। খাদিজা (রা.) তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর চরিত্র মধুরিমার বর্ণনা তাঁর সামনে এভাবে তুলে ধরলেন,

---

[১৩৫] সূরা আহযাব : ২১।

[১৩৬] সহীহ মুসলিম : ৭৪৬। সুনানে আবি দাউদ : ১৩৪২। মুসনাদে আহমাদ : ২৩৪৬০।

كلا والله لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

'কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অসহায় দুস্থদের পাশে দাঁড়ান। নিঃস্বদের সহযোগিতা করেন। মেহমানদের মেহমানদারি করেন এবং ন্যায়ের পথে বিপথগ্রস্তদের সাহায্য করেন।'[১৩৭]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করতেন, তিনি যেন তাকে উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচার দান করেন। দোআ করে বলতেন,

"اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দৈহিক সৌন্দর্য দান করেছেন। কাজেই আপনি আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।'[১৩৮]

আল্লাহ তাআলা তাঁর দোআ কবুল করেছিলেন। তাই তাঁর চরিত্র ছিল কোরান। তিনি পবিত্র কোরানের হুবহু প্রতিচ্ছবি ছিলেন। কোরানের সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হতেন। কোরানের অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।[১৩৯] আপনারা কি কোরান পড়েন না?

আল্লাহ তাআলা তাকে যে মহা সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন এবং যে সত্য দীনের দাওয়াতের জন্য তাকে মনোনীত করেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই দীনের জীবন্ত ছবি। পবিত্র কোরানে বর্ণিত সকল প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলির বাস্তবপ্রয়োগ আপনি তাঁর জীবনে দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সম্বোধন করে বলেন,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

---

[১৩৭] সহীহ বুখারী, ওহির সূচনা অধ্যায় : ৩।

[১৩৮] মুসনাদে আহমাদ। বায়হাকী। খারাইতি, মাকারিমুল আখলাক : ৯; ইতহাফুস সারি, ৭ : ৩২২।

[১৩৯] অর্থাৎ, তিনি কেউ কোরআনের আদেশ পালন করলে সন্তুষ্ট হতেন এবং কেউ লঙ্ঘন করলে অসন্তুষ্ট হতেন।

'আপনি যা জানতেন না আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। আর আপনার ওপর আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে।'[১৪০]

নিম্নোক্ত হাদিসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়ত ও রেসালাতের মহান উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

'নিশ্চয় আমি চরিত্রের যাবতীয় উত্তম গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছি।'[১৪১]

নবুয়তের আগে বা পরে–তাঁর সমগ্র জীবনীতে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি যা সর্বোত্তম চরিত্র ও পূর্ণাঙ্গ মানব আদর্শের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার এমনই চূড়ায় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, রেসালাত ও দাওয়াতের অবস্থান।

স্বভাবগত বিষয়াদি

তিনি ছিলেন উত্তম ও নম্র আচরণের অধিকারী। সহজ বিষয় পছন্দ করতেন ও সহজকে প্রাধান্য দিতেন। দুটি বিষয়ের মাঝে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে গুনাহর কাজ না হলে সহজ বিষয়টি বেছে নিতেন। গুনাহর কাজ হলে তিনি সবার চেয়ে দূরে থাকতেন। পবিত্র দীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে উন্নত আখলাক ও উত্তম স্বভাব গ্রহণ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মহৎ কর্ম পছন্দ করেন এবং অর্থহীন কর্ম অপছন্দ করেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাচার ও সৎকর্ম পছন্দ

---

[১৪০] সূরা নিসা : ১১৩।

[১৪১] মুসনাদে আহমাদ, ২ : ৩৮১। মুসতাদরাকে হাকেম, ২ : ৬১৬। বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১০ : ১৯২।

করতেন। যাবতীয় উত্তম স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লোকদের আহবান করতেন। যেমন আহার দান করা, বেশি বেশি সালাম দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, দুর্বল-অসহায়কে সাহায্য করা ও দাওয়াত কবুল করা।

মনিব-ক্রীতদাস সকলের দাওয়াত কবুল করতেন। অহংকারবশত কখনো কোনো গরিব-দুর্বলশ্রেণীর মুসলমানের কিংবা কোনো দাস-দাসীর দাওয়াত ফিরিয়ে দিতেন না। বরং খুবই আন্তরিকতার সাথে সে দাওয়াত গ্রহণ করতেন।

তাঁর কাছে কোনো খাবার হাদিয়া এলে তিনি সাহাবিদের দাওয়াত দিতেন। তাদের রেখে নিজেও খেতেন না। নিজের পরিবারের কাউকেও খেতে দিতেন না। অসহায় দরিদ্র সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন। তাদের সাহায্য করতেন। সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন। তাদের বাদ দিয়ে নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না।

ক্ষমা করা পছন্দ করতেন। মানুষের মাঝে আপস-মীমাংসা ও সমঝোতা করার চেষ্টা করতেন। সত্য ও ন্যায়ের ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যাকুল থাকতেন।

সমাজসংস্কার

আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজ ছিল নিজেদের রুসুম-রেওয়াজ, রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাসের প্রতি যে কোনো সমাজের চেয়ে কট্টর ও রক্ষণশীল। অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের চেয়ে তারা ছিল অধিক কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হিংসা-বিদ্বেষ প্রিয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি. ক্ষমা ও উদারতার ভয়াবহ রকমের অভাব ছিল তাদের মাঝে। বর্বরতা ও হিংস্রতায় তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে ছিল। কিন্তু এই মানুষগুলোই যখন আল্লাহর রাসূলের সোহবত লাভ করল, তাঁর পরশতুল্য সংস্পর্শে এলো; তাদের সেই জাহেলিয়াতপূর্ণ গোত্রপ্রীতি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতা দূর হয়ে গেল। প্রত্যেকে এমন শুদ্ধ ও পবিত্রতম মানুষে পরিণত হলো, আসমানের ফেরেশতারা তাদের ঈর্ষা করতে লাগল। সমাজের সর্বত্র শান্তি-নিরাপত্তা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশাল এই পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেছিলেন মাত্র দু'যুগেরও কম সময়ে। মানবেতিহাসের মহাস্রোত প্রবাহে,

যুগের পট পরিবর্তনে ও কালের আবর্তন-বিবর্তনে যা খুবই সামান্য সময়। যেন দুটি মুহূর্ত।

আপনি কি এমন কোনো মহামানবের কথা পড়েছেন কিংবা শুনেছেন, যিনি বিচ্ছিন্ন ও উদ্ধত মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কেবল ভালোবাসা ও চিরন্তন মানবতার শক্তিতে, যে মানবতা রাসূলের আনীত দীনের সঞ্জীবসুধার পরশে নবজীবন লাভ করেছিল, তারপর ইসলামের সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির ছোয়ায় পূর্ণতা পেয়েছিল এবং আল্লাহর রঙে রঙিন হয়েছিল। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কী-ইবা আছে?

পরস্পর বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সুতোয় বাঁধতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সফলতা পৃথিবীর আর কেউ দেখাতে পারেনি। তা কেবল সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর দয়া ও তাওফিকে, তাঁর অনুগ্রহ ও সাহায্যে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি আপনাকে তাঁর সাহায্যে ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের হৃদয়গুলো প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আপনি তার সবটুকু খরচ করলেও তাদের অন্তরগুলো প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহাপ্রজ্ঞাবান।’[১৪২]

বিদায় হজের দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা উচ্চ আওয়াজের কোনো স্লোগান ছিলো না। কিংবা সংস্কারবাদীদের ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের কোনো দাবি ছিল না। উচ্চাভিলাষী কোনো মানুষের অভিলাষও ছিলো না তা; বরং তা ছিল সুস্পষ্ট নিখাঁদ নির্ভেজাল বাস্তবতা, যা দুই দশকের নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ ও কুরবানির পর বিজয় মুকুট ধারণ করেছিল এবং যা তাঁর দাওয়াত ও রেসালাতের সফলতার স্মারক বহন করেছিল। যেন তা ছিল আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহের শোকর আদায়ের একটি যথার্থ চিত্র।

---

[১৪২] সূরা আনফাল ৬৩।

বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে বললেন,

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.

'নিশ্চয় জাহেলিয়াতের সবকিছু আমার পদতলে কবর দেওয়া হয়েছে।'

আপনি তাঁর নবুয়তী জীবনের পাতা উল্টাতে থাকুন আর ভাবতে থাকুন ; রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা কি কোনো নিছক দাবি ছিল নাকি তাঁর বাস্তবায়ন করে যাওয়া মহাসত্য ও বাস্তবতা?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল ছিল খুব সামান্য। সংক্ষিপ্ত এই জীবনকালকেই আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির চির কল্যাণ, মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন।

নিজের পবিত্র জবানে কুফর ও সকল অন্যায়ের মোকাবেলা যেমন করতেন তেমনি তরবারির মাধ্যমেও করতেন। সাহাবিদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। তাদের সুপথ দেখাতেন। শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিতেন। নিজের সমস্ত কথা-কাজ ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আত্মশুদ্ধি করতেন। সৎকাজের আদেশ দিতেন। অসৎ কাজের নিষেধ করতেন।

বীরত্ব ও সাহসিকতা

যুদ্ধের ময়দানে সর্বাগ্রে ও শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকতেন। যে তাঁর সমকক্ষ হয়ে লড়তে পারত সেই ছিল তাদের মাঝে সাহসী বীর। যুদ্ধের ময়দানে নামাজের কাতারের মতো সাহাবিদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করাতেন। তাদেরকে ফেরেশতাদের ন্যায় কাতার সোজা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

সবচেয়ে সাহসী দৃঢ় অবিচল ও ধৈর্যশীল ছিলেন। যখন ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধত, চক্ষু লাল হয়ে যেত, তখন তাঁর সাহাবিরা তাকে সামনে রেখে তাঁর পেছনে থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা করত। সেসময় তিনিই শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকতেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে হুংকার ছুঁড়তেন। আত্মগোপন করে থাকতেন না।

বাহিনীকে সুশৃঙ্খল করতেন। সেনাপতিদের নির্দেশনা দিতেন, সবর ও জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। যেসব বিষয়ে ওহি অবতীর্ণ হতো না, সেসব বিষয়ে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাদের কোনো অভিমত সঠিক মনে হলে গ্রহণ করতেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতেন। সাহাবায়ে কেরামকে নেতৃত্বদান ও সর্বাবস্থায় অটল অবিচল থাকার প্রশিক্ষণ দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হয়ে যেতো। স্বর উঁচু হয়ে যেতো এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেতো। মনে হতো যেন তিনি আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে এ বলে সতর্ক করছেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রুবাহিনী আক্রমণ করতে পারে'।

ঘরোয়া জীবন

যখন ঘরে আসতেন গৃহীর মতো সাধারণ ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঘরের লোকদের সেবা ও সহযোগিতায় সময় দিতেন।[১৪৩] নিজের কাজ নিজে করতেন। কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সেলাই করতেন। জুতা মেরামত করতেন।[১৪৪] পরিবারের মানুষদের সাথে খুনসুটি করতেন। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। ছোটোদের সাথে খেলতেন, বড়দের সাথে আন্তরিকভাবে মিশতেন। ভুলত্রুটি ক্ষমা করতেন, স্ত্রীগণের মাঝে মিল-মহব্বত সৃষ্টি করতেন। তাদের ঈর্ষাকাতরতা হ্রাস করতেন।

আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছাড়া কারও উপর কোনোদিন আঘাত করেননি। স্ত্রী, খাদেম বা আপন অধীনস্থ কারও গায়ে কোনো দিন একটি টোকা পর্যন্ত দেননি।

তাঁর আদেশকৃত কোনো বিষয় খাদেম ভুলে গেলে পরিবারের কেউ তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করুক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন, ছেড়ে দাও; আল্লাহ তাআলার ফায়ছালা থাকলে তা অবশ্যই হতো।

---

[১৪৩] আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে ঘরে এসে ঘরের লোকদের সেবা ও সহযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নামাজের সময় হলে মসজিদে চলে যেতেন। (সহীহ বুখারী : ৬৭৬)

[১৪৪] আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা নিজে ঠিক করতেন এবং নিজ হাতে কাপড়ের ছেঁড়া জায়গা সেলাই করতেন। (মুসনাদে আহমাদ : ২৪৭২৭)

আনাস বিন মালেক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন। কোনো কাজ করে ফেললে কখনো বলেননি, এটা করলে কেন? আবার কোনো কাজ না না করলেও বলতেন না, এটা করলে না কেন?

ইবাদতমগ্নতা

নামাজের সময় হলে নামাজে চলে যেতেন। কোনো কিছু তাঁকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। যখন একা থাকতেন একাগ্রতার সঙ্গে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। নামাজ, দোআ, রোজা যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে কেউ তাঁর মতো মোজাহাদা করতে পারত না। রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। অর্ধরাত কিংবা তারও অধিক সময় তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। তারপর সকাল হতেই সাহাবাদের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের তালিম দেওয়া, তারবিয়াত করা, দাওয়াতের কাজে অবিশ্রান্তভাবে ছুটে চলা, উম্মতকে পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজতো ছিলই।

যখন রোজা রাখা শুরু করতেন তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা বলত, মনে হয়, আর রোজা ভাঙবেন না কখনো। এত অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন। টানা দু দিন, তিন দিন কিংবা তারও অধিক একটানা না খেয়ে রোজা রাখতেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের এভাবে একটানা রোজা রাখতে নিষেধ করতেন। কারণ, তাঁর ব্যাপারটি ভিন্ন। তিনি তাদের মতো নন। তাঁর রবের সান্নিধ্যে তিনি রাত্রি যাপন করেন। তিনি তাঁকে পানাহার করান।

দানশীলতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহান দাতা। দানের নিসীম সাগর। তাঁর কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি 'দেব না' বলেছেন, এমনটি কখনো হয়নি।

রহমতের প্রেরিত বায়ুর চেয়েও রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক দানশীল ছিলেন। অনেক সময় তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হতো, কিন্তু সেটা তার কাছে থাকতো না। তখন তিনি প্রার্থনাকারীকে বলতেন,

اِسْتَدِنْ عَلَيَّ، حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَنَقْضِيَه.

'আমার নামে কারও কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নাও। আমার কাছে যখন কোনো সম্পদ আসবে আমি পরিশোধ করে দেব।'

নবীজী এমনভাবে দান করতেন যে, মনে হতো তাঁর দারিদ্রের কোনো ভয় নেই। ইসলামের প্রতি মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করতে দান করতেই থাকতেন। ফলে সবাই তাকে অত্যধিক পরিমাণে ভালোবাসত। এমনকি তারা তাকে নিজেদের জানমাল ও পরিবারের চেয়েও অগ্রাধিকার দিত।

উদার হস্তে দান করতে থাকতেন। পাহাড়সম দান। অথচ তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন উপবাস থেকে রাত কাটাত। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। তাঁর কাছে আসা একটি দিরহামও কখনো নিজের ঘরে নিয়ে যাননি।

ক্ষমা

কেউ তাঁর উপর জুলুম করলে তাকে ক্ষমা করে দিতেন। সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেন। কেউ তাঁকে বঞ্চিত করলে তাকে দান করতেন। ব্যক্তিগত কারণে কখনো রাগ করতেন না এবং সেটার প্রতিশোধও নিতেন না। কিন্তু শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। সেই ক্রোধের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তাকে সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি তাঁর কওমের লোকদের জন্য বদদোআ করেননি। তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাননি; বরং তিনি তাদের জন্য হেদায়াতের দোআ করে বলতেন,

اللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে আপনি হেদায়েত দান করুন। কারণ, তারা অবুঝ।'[১৪৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দীনের পথে মক্কার কাফেরদের

[১৪৫] সহীহ বুখারী : ৩৪৭৭, ৬৯২৯। সহীহ মুসলিম : ১৭৯২।

কাছ থেকে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হলেন, তখন তাঁর সামনে ফেরেশতারা উপস্থিত হলো এবং তাদের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু তিনি কী বললেন,

لَا، بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

'না; বরং আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মাঝে এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না।'[১৪৬]

লজ্জাশীলতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সহনশীল, সবচেয়ে সাহসী, অধিক ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। দেখা করা জায়েজ নয় এমন কোনো নারীর হাত কখনো স্পর্শ করেননি।

ভীষণ লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অন্তঃপুরে থাকা পর্দাশীল কুমারী নারীর চেয়েও। লজ্জার কারণে কারো চেহারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। অপছন্দনীয় বিষয় থেকে চোখ বন্ধ করে রাখতেন। অনুত্তম কোনো কথা বা কাজ উপেক্ষা করে চলতেন।

হাদিয়া গ্রহণ করতেন। বিনিময়ে তার চেয়ে অধিক প্রদান করতেন। হাদিয়ার সম্পদ থেকে খেতেন। সদকার বস্তু থেকে খেতেন না।

দুনিয়াবিমুখতা ও আখেরাতমুখিতা

ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বাঁধতেন। কখনো একাধিক পাথর বাঁধতেন। খাওয়ার মতো কিছু না পেলে সারা দিন রোজা রেখে কাটিয়ে দিতেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে উপস্থিত হওয়া কোনো খাবার ফিরিয়ে দিতেন না। সব ধরনের খাবার খেতেন। কখনো হেলান দিয়ে বসে খেতেন না। দুপুরে খেলে রাতে উপোস থাকতেন। রাতে খেলে দুপুরে

[১৪৬] সহীহ বুখারী : ৩২৩১।

উপোস থাকতেন। আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার (দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার) আগ পর্যন্তজীবনে কখনো টানা তিন দিন যবের রুটিও পেট ভরে খাননি। এমনটি তিনি দরিদ্রতা ও কৃপণতার কারণে করেননি;[১৪৭] বরং দুনিয়াবিমুখতা ও আখেরাতকে দুনিয়ার সকল নেয়ামতের ওপর প্রাধান্য দানের লক্ষ্যে এমন কৃচ্ছতা অবলম্বন করেছিলেন।

নতুন চাঁদ উঠত। আবার নতুন চাঁদ উঠত। এভাবে দুমাসে তিনটি নতুন চাঁদ অতিবাহিত হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। কেবল দুটি কালো জিনিস অর্থাৎ, খেজুর ও পানি ছিল তাদের খাবার।[১৪৮]

সব সময় মেহমানের ভিড় লেগে থাকত। অনেক সময় এমন হতো, মেহমান আসতেন। আপ্যায়নের জন্য ঘরে কোনো খাবার আছে কিনা স্ত্রীগণের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চাইতেন। তখন তারা সবাই কসম করে বলত, তাদের কাছে কোনো খাবার নেই। তখন কোনো সাহাবি সেই মেহমানকে তার ঘরে নিয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য ও নিজের পরিবারের মানুষের জন্য এমন দরিদ্রতা ও দুনিয়াবিমুখতা বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন–তিনি হয়তো অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী সাধারণ বান্দা ও নবী হবেন কিংবা দুনিয়ার ভোগবিলাস গ্রহণকারী বাদশাহ ও নবী হবেন। তখন তিনি সাধারণ বান্দা ও নবী হয়ে থাকাকে পছন্দ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَجُوْعُ يَوْماً فَأَصْبِرُ، وَأَشْبَعُ يَوْماً فَأَشْكُرُ،

> 'আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। তখন আমি সবর করব। আবার একদিন তৃপ্তির সঙ্গে খাব, তখন আমি আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করব।'

---

[১৪৭] আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসটি সহীহ বুখারীতে ৫৪২৩ নং হাদিসে রয়েছে।

[১৪৮] আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসটি সহীহ বুখারীতে ২৫৬৭ নং হাদিসে রয়েছে।

সবচেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে সবচেয়ে হাস্যোজ্জ্বল ও বিনয়ী। আল্লাহ তাআলা তাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা সুসংক্ষিপ্ত ও মর্মসমৃদ্ধ কথার নেয়ামত দান করেছিলেন। মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী বানিয়েছিলেন। তাঁর কথাকে অর্থপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। দুনিয়াবি কোনো আকর্ষণীয় বিষয় দেখলে তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ.

'হে আল্লাহ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।'[১৪৯]

পার্থিব সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি কখনো চোখ তুলে তাকাতেন না। তিনি বলতেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি তো কেবল একজন মুসাফির- যে একটি গাছের ছায়ায় ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে তারপর তা ছেড়ে (গন্তব্যের দিকে) চলে গেল।[১৫০]

তিনি যে পোশাক পেতেন তাই পরতেন। তাঁর পোশাক ছিল খুব সাধারণ। বাহন হিসেবে ঘোড়া, খচ্চর, গাধা কিংবা উট যেটাই পাওয়া যেত তিনি আরোহণ করতেন। তাঁর পেছনে তাঁর গোলাম কিংবা অন্য কেউ আরোহণ করত। তিনি হাঁটতেন, কখনো খালি পায়ে কিংবা জুতা অথবা মোজা পড়ে।

সামাজিক জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি পছন্দ করতেন। সাহাবায়ে কেরামকে পরিপাটি ও সুন্দর হয়ে থাকার আদেশ করতেন। তাদের জরাজীর্ণ হয়ে থাকাটা অপছন্দ করতেন। কোনো ধরণের দুর্গন্ধ সহ্য করতেন না। দরিদ্রদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন। গরিব মুসলমানদের সঙ্গে বসে খাবার খেতেন। মজলিশের প্রত্যেককে এতটা গুরুত্ব দিতেন যে কেউ এ ধারণা করত না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার চেয়ে অধিক মর্যাদার পাত্র আর কেউ আছে। প্রত্যেক গোত্রের গুণী ব্যক্তিদের সম্মান করতেন। তাদের কাছে ডাকতেন। যথাযথ মর্যাদা দিতেন। মানুষের সামনে

---

[১৪৯] সহীহ বুখারী : ২৯৬১। সহীহ মুসলিম : ৪৬৪৯।

[১৫০] জামে তিরমিযী : ২৩৭৭।

তাদের মর্যাদার কথা তুলে ধরতেন। সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সদাচরণ ও অন্তরঙ্গতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তাদের মন জয় করতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। তাদের ভুলে যেতেন না। তবে কখনো স্বজনপ্রীতি করতেন না। তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারও উপর তাদের প্রাধান্য দিতেন না। মানুষের অপারগতা মেনে নিতেন। কারও সাথে রূঢ় আচরণ করতেন না। তাঁর সহনশীলতা নম্রতা ও সদাচারের দ্বার ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত।

সাহাবায়ে কেরাম ও আপন স্ত্রীগণের সঙ্গে রসিকতা করতেন। শিশুদের সঙ্গে মজা করতেন। তবে রসিকতা ও মজার ছলেও তিনি অন্যায় কিছু বলতেন না। সব সময় সত্য বলতেন। বেশির-ভাগ সময় মুচকি হাসতেন। কখনো হাসলেও অট্টহাসি দিতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় বিষণ্ন, সদা চিন্তিত থাকতেন। তার যেন কোনো স্বস্তি ছিল না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকতেন। ভরাট মুখে কথা বলা শুরু করতেন এবং কথা শেষ করতেন। সারগর্ভপূর্ণ কথা বলতেন, যা হতো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, অর্থহীন ও বাহুল্য নয়। আবার উদ্দেশ্য প্রকাশে অক্ষম এমন সংক্ষেপও নয়। কোমল স্বভাব, কঠোর ও রূঢ় নন। আবার আত্মমর্যাদাহীন মুখসর্বস্বও নন। কারও দান বা অনুগ্রহ ক্ষুদ্র হলেও অনেক বড় মনে করতেন। কোনো কিছুর নিন্দা করতেন না, আবার অতিরিক্ত প্রশংসাও করতেন না। খাবার ভালো লাগলে খেতেন। খারাপ লাগলে রেখে দিতেন। কিন্তু কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না।

নিজের স্বার্থে কখনও রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে সেটার প্রতিবিধান করার আগ পর্যন্ত কোনো কিছু তাঁর ক্রোধের সামনে টিকতে পারত না। যখন ইঙ্গিত করতেন পূর্ণ তালু দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। আর যখন আশ্চর্য হতেন তখন তা উল্টাতেন। যখন ক্ষুব্ধ হতেন, উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিতেন। প্রসন্ন হলে দৃষ্টি অবনত রাখতেন। অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। তিনি শিলা শুভ্র দাঁতে হাসতেন। কারও চেহারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন না। আনত দৃষ্টি। আসমানের দিকে দৃষ্টির চেয়ে জমিনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি থাকত।[১৫১] তাঁর অধিকাংশ দৃষ্টিই হতো গভীর মনোযোগপূর্ণ।

---

[১৫১] ওহি নাযিলের সময় সাধারণত তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

কারও প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন না। তাঁর কাছে কারও ব্যাপারে কোনো অভিযোগ কিংবা অপছন্দনীয় বা আপত্তিকর সংবাদ এলে তিনি এভাবে বলতেন না, অমুক ব্যক্তির কি হলো সে এরূপ কাজ করে? বরং এভাবে বলতেন,

مَا بَالُ قَوْمٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا؟

'লোকদের কী হলো, যে তারা এরূপ কাজ করে।'[১৫২]

অনর্থক বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। এমন আচরণ করতেন না যাতে তারা বিরক্ত ও বিরূপ হয়ে দূরে সরে যায়। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানী ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান দিতেন এবং তাকে তাদের নেতা বানাতেন। মানুষকে অন্যায়-অনাচার থেকে সতর্ক করতেন। নিজেও তাদের থেকে সতর্ক থাকতেন। তবে সবার সঙ্গে তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন। উদার আচরণ করতেন।

সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের কারও অবস্থা জানতে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতেন। সুন্দরকে সুন্দর বলতেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কুৎসিতকে কুৎসিত বলতেন এবং সেটাকে দুর্বল করে দিতেন। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ভারসাম্যপূর্ণ নিখাঁদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। লোকেরা যাতে উদাসীন ও সত্যবিচ্যুত না হয়, সে জন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন। সব রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য তাঁর কাছে ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি থাকত। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা ও শিথিলতা করতেন না। আবার সীমালঙ্ঘনও করতেন না। শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকেরাই হতো তাঁর কাছের মানুষ, ঘনিষ্টজন। যারা মানুষের পরম হিতকামী ও সর্বাধিক কল্যাণকামী তারাই তাঁর কাছে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হতো। মানুষের প্রতি যারা অধিক সহমর্মী ও সমব্যথী তারা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করত।

নবীজীর মজলিশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিকির অবস্থায় থাকতেন। যিকিরের সঙ্গে চলাফেরা করতন। মজলিশে নিজের বসার জন্য

[১৫২] সুনানে আবী দাউদ : ৪৭৮৮।

কোনো স্থান নির্ধারণ করতেন না এবং সাহাবায়ে কেরামকেও বসার স্থান নির্ধারণ করতে বারণ করতেন। কোনো মজলিশে উপনীত হলে মজলিশের শেষ মাথায় বসে যেতেন এবং অন্যদেরও এমনটি করার নির্দেশ দিতেন। মজলিশের সবার প্রতি তিনি সমান মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মজলিশে কারও এমন ধারণা হতো না যে, তার চেয়ে কেউ নবীজীর কাছে অধিক সম্মানের পাত্র। (প্রত্যেক সাহাবিই মনে করত সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তি)। কোনো প্রয়োজনে কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি ওই ব্যক্তির (প্রয়োজন পূরণ হয়ে) না যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতেন। অর্থাৎ তাকে সঙ্গ দিতেন। প্রয়োজনে তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি দান করতেন, কিংবা তাকে সুন্দর কথার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিতেন। সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার ও সদাচরণ করতেন। তাই তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। সবাইকে তিনি সমান অধিকার দিতেন। তাঁর নৈকট্য ও তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র মানদণ্ড ছিল তাকওয়া। অর্থাৎ, তাকওয়া ও খোদাভীতির মানদণ্ডে তাঁর কাছে তারা একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত।

তাঁর মজলিশ ছিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মজলিশ, যেখানে কারও আওয়াজ উঁচু হতো না। কারও অন্দর, অন্তঃপুরের (পারিবারিক ও ব্যক্তিগত) দোষচর্চা হতো না এবং খুঁটিনাটি দোষত্রুটির চর্চাও হতো না। মজলিশে বড়কে তারা সম্মান করতেন, ছোটোকে স্নেহ করতেন। কারও কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তারা সেই প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং আগন্তুককে সমাদর করতেন।

বিনয়নম্রতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া ছিল সাহাবায়ে কেরামের কাছে অধিক প্রিয় বিষয়। তবে যেহেতু তারা জানতেন তিনি এ বিষয়টি অপছন্দ করেন তাই তারা তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন না। রাসূলুল্লাহ তাঁর অত্যধিক প্রশংসা করতে সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করতেন, ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা যা করে থাকে। তিনি তাদের বলতেন,

قُوْلُوْا : عَبْدُ اللهِ وَ رَسُوْلُه.

'তোমরা শুধু বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ.

'আমি একজন গোলাম। গোলামের মতো বিনয়ের সঙ্গে বসি এবং গোলামের মতো বিনয়ের সঙ্গে খাবার খাই।'[১৫৩]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। (নবীজীর গাম্ভীর্যতার কারণে) তাকে দেখে ভয়ে সে ব্যক্তির কাঁধের গোশত কাঁপছিল। তখন তিনি তাকে বললেন,

هَوِّنْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَنَا اِبْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ بِمَكَّةَ.

'তুমি শান্ত হও; স্বাভাবিক হও (আমি কোনো রাজাবাদশা নই)। আমি তো মক্কায় শুকনো গোশত খেয়ে জীবনধারিণী সাধারণ এক মহিলার পুত্র।'

[১৫৩] আবু শাইখ আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

চারিত্রিক অন্যান্য গুণাবলি

সব সময় হাসিমুখে থাকতেন। নম্র ও কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। রূঢ়, কঠোর ও কর্কশ নন। চিৎকার বা হৈচৈকারী নন। অশ্লীলভাষীও নন। নন অধিক সমালোচনাকারী ও অতি প্রশংসাকারী। মন্দ আচরণের প্রতিদান মন্দ আচরণ দিয়ে দিতেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলতেন। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন, ১- রিয়া তথা লৌকিকতা ২- অতিকথন, ৩- অনর্থক ও অর্থহীন বিষয়। আর লোকদের তিনটি বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছিলেন,

১. মানুষের নিন্দা ও সমালোচনা করতেন না।
২. কাউকে লজ্জা দিতেন না।
৩. কারও ছিদ্রান্বেষণ করতেন না।

শুধু এমন বিষয়ে কথা বলতেন, যেসব বিষয়ে তিনি সওয়াবের প্রত্যাশা রাখেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর মজলিশে উপবিষ্টরা এমন নিশ্চুপ হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি থামলে তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা বাদানুবাদে জড়াতেন না। কেউ তাঁর মজলিশে বসে কথা বললে সেই ব্যক্তির কথা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনতেন। তাদের যে কারও কথা তাদের প্রথমজনের কথায় ন্যায়। তারা যাতে হাসতেন তিনিও তাতে হাসতেন। তারা যাতে বিস্মিত হতেন তিনিও তাতে বিস্মিত হতেন। নবাগত ও অপরিচিত ব্যক্তি রুক্ষ ভাষায় কথা বললে ও অভদ্রভাবে প্রার্থনা করলে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। আর বলতেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ الْحَاجَةِ فَأَرْفِدُوْهُ.

'তোমরা পরমুখাপেক্ষী ও অভাবগ্রস্তকে দেখলে তার প্রয়োজন পূরণ করে দাও।'

কোনো উপকৃত ব্যক্তির শোকরবাণী ছাড়া অন্য কারও প্রশংসাস্তুতি গ্রহণ তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

মজলিশে সবচেয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। সহজে কোনো কথা বলতেন না। বেশির-ভাগ সময় চুপ থাকতেন। প্রয়োজন হলে কথা বলতেন। কেউ অশোভনীয় কোনো কথা বললে উপেক্ষা করতেন। মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

তিনি এত কম কথা বলতেন যে-কেউ শুনতে চাইলে শুনতে পারত। অনবরত কথা বলতে থাকতেন না। শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য তিনবার করে বলতেন। তাকে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কখনো দু-পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি। কোনো সাহাবি তাকে ডাক দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, লাব্বাইক লাব্বাইক।

সাহাবিদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে অপছন্দ করতেন।

তাদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। ঘনিষ্টভাবে মিশতেন। কথা বলতেন। হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। বিভিন্ন কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেককে একান্ত বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন; যাতে তিনি সাহায্য করতে পারেন। তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতেন। হাস্যরসিকতা করতেন। নিজের কোলে এনে বসাতেন। অনেক সময় বাচ্চারা তার কোলে পেশাব করে দিত। তিনি সেই পেশাবের উপর হালকাভাবে পানি ঢেলে নিতেন। কাপড় পালটাতেন না।

নামাজ পড়ার সময় তার ভেতর থেকে চুলার উপরের ডেকচি থেকে নির্গত শব্দের ন্যায় কান্নার আওয়াজ বের হতো। তিনি বলতেন,

إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰه وَ أَتْقَاكُمْ لَه.

> 'তোমাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি ও তাঁর প্রতি অধিক অনুগত।'[১৫৪]

আপন পরিবারের লোকদের তিনি বিশেষ সুবিধা প্রদান করতেন না; বরং পরিবারের চেয়ে অন্যদের বেশি প্রাধান্য দিতেন। তাদের রেখে সাহাবিদের দান করতেন। এভাবে তিনি পরিবারের লোকদের দুনিয়াবিমুখতা ও আখেরাতমুখিতার শিক্ষাদান করতেন। একবার তাঁর কাছে অনেক যুদ্ধ বন্দি এলো। তখন নবীজীকন্যা সাইয়েদা ফাতেমা (রা.) এলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘরের কাজ করার কষ্ট সম্পর্কে অনুযোগ করলেন এবং একজন খাদেম চাইলেন যে তার ঘরের যাবতীয় কাজ করে দেবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমের পরিবর্তে তাকে তিন তাসবিহর আমল শিক্ষা দিলেন। 'সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু

---

[১৫৪] সহীহ বুখারী : ৫০৬৩।

আকবার' পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বললেন। আর বললেন,

لاَ أُعْطِيْكَ وَ أَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوِيْ بُطُوْنُهُم الْجُوْعَ.

'আহলে ছুফফার সদস্যরা না খেতে পেয়ে উপোস করছে, তাদের রেখে আমি তোমাকে দিতে পারি না।'

সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মজলিশগুলো হতো–সেখানে তিনি তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার স্মরণ জাগ্রত করা, তাদের শিক্ষাদান, উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, সতর্ককরণ ও সুসংবাদ শোনানো–এসব তারবিয়াতী কাজ করতেন। এসব মজলিশ সাহাবিদের অন্তরকে বিগলিত করত। তাদের দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতমুখী করে তুলত। তাদের মাঝে ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদামুক্ত হওয়ার গুণ সৃষ্টি করত।

তিনি তাঁর সাহাবিদের উপদেশ দিতেন- তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি, সততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হওয়া, আমানতের খেয়ানত না করা, প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা, মেহমানকে সম্মান করা, এতিমের প্রতি দয়া করা, নরম ভাষায় কথা বলা, সালাম প্রদান করা, আহার দান করা, বড়কে সম্মান করা, ক্ষমা ও মার্জনা করা, বিবদমান মানুষের মাঝে সমঝোতা করানো, ক্রোধ সংবরণ, ক্রোধ বর্জন, অধিক পরিমাণে জিকির ও তওবা এস্তেগফার করার।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম প্রায়ই গণনা করতেন-এক এক মজলিশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরবারেরও অধিক তওবা এসতেগফার করেছেন।

পবিত্র দীন ইসলামের মাধ্যমে তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত আচার-অভ্যাস ও রীতিনীতি, তাদের অনৈতিক ও মন্দ স্বভাব চরিত্রকে বর্জনীয় সাব্যস্ত করেছেন। গানবাদ্যকে হারাম করেছেন। মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, গিবত-পরনিন্দা, কৃপণতা-ব্যয়কুণ্ঠতা, ধোঁকা-প্রতারণা, মন্দ ধারণা, পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন, অহংকার-গর্ব-ঔদ্ধত্য, হিংসাবিদ্বেষ পোষণ, যাদুটোনা, অশুভলক্ষণ গ্রহণ, জুলুম-অত্যাচার, শত্রুতা, মিথ্যা অপবাদ, চুগলখোরী ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ ইত্যাকার মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

মিথ্যা ছিল নবীজীর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয়। পরিবারের কারও মিথ্যার ব্যাপারে অবগত হলে তাঁর চেহারা মোবারক বিরূপ হয়ে যেত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা থেকে তওবা করত।

রাতে ঘরে এসে তিনি তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন, এক ভাগ আল্লাহর জন্য। এক ভাগ নিজের জন্য। এক ভাগ স্ত্রী-পরিজনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য। নিজের অংশটি তিনি নিজের ও সাক্ষাতপ্রার্থী লোকদের মাঝে বণ্টন করে নিতেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলকে সময় দিতেন। তাদের থেকে কোনো অংশই সংরক্ষিত রাখতেন না।

লোকদের জন্য নির্ধারিত অংশে তাঁর নীতি ছিল, সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি গুণী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতেন এবং দীনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনুপাতে তাদের সময় দিতেন। এদের মাঝে কারও একটি, কারও দুটি কিংবা কারও বা ততোধিক প্রয়োজন থাকত। তিনি মনোযোগের সাথে তাদের সেসব প্রয়োজনের কথা শুনতেন এবং তাদের ও সকলের জন্য কল্যাণ ও হিতকর ব্যবস্থা প্রদান করতেন এবং তাদের করণীয় কী তা বলে দিতেন।

হিনদ ইবনে আবি হালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ وَ أَبْلِغُوْنِيْ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ إِبْلَاغَهَا إِيَّايَ، فَإِنَّه مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ إِبْلَاغَهَا إِيَّاه ثَبَّتَ الله قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়। আর যে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না তোমরা তার হয়ে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেবে। কেননা যে ব্যক্তি কোনো ক্ষমতাবানের (কর্তৃপক্ষের) কাছে এমন ব্যক্তির কথা পৌঁছে দেয়, যে নিজে তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না, আল্লাহ তাআলা পুলসিরাতে তার পদদ্বয় স্থির অবিচল রাখবেন যেদিন সমস্ত পা পিছলে যাবে।'[১৫৫]

[১৫৫] মুজামে তাবারানি, কাবির : ১৫৮।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মানুষের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কিছু আলোচিত হতো না। কারও থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু তিনি শুনতেন না।

মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর কাছে যেতো। তবে কিছু না কিছুর স্বাদ আস্বাদন করে তারা ফিরতো। তাঁর কাছ থেকে তারা ফিরতো কল্যাণের পথপ্রদর্শকরূপে।

যেসব বিষয়ে অহি অবতীর্ণ হতো না, সেসব বিষয়ে তিনি তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে অধিক পরামর্শ করতেন। তাদের কারও কারও মত তিনি গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি তাঁর দুই ঘনিষ্ট সঙ্গী আবু বকর ও উমর (রা.)-কে বলেন,

لَوْ اِجْتَمَعْتُمَا فِيْ مَشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا.

'তোমরা দুজন কোনো ব্যাপারে একমত হলে আমি তোমাদের মতের বিরুদ্ধে যেতাম না।'[১৫৬]

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিদের বিভিন্ন উপনাম রাখতেন এবং তাদের সবচেয়ে পছন্দের নাম ধরে ডাকতেন। মন্দ বা অপছন্দনীয় নামগুলো সুন্দর নাম দ্বারা পরিবর্তন করে দিতেন। অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করতেন। শুভ লক্ষণ গ্রহণে তিনি আনন্দিত হতেন। আর তা হলো কালেমা তাইয়েবা।

জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন, এমনকি সর্ববিষয় ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

মানুষকে যেসব বিষয় নিষেধ করতেন তিনি নিজে সেসব বিষয় সবচেয়ে বেশি পরিহার করে চলতেন। ইবাদাত, দোআ ও জিকিরের প্রতি তাঁর অন্তরের আকর্ষণ ও টান ছিল সুতীব্র।

রাতে এত অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে ফেটে যেত। পরিবারের লোকজন ও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এত কষ্ট করছেন, অথচ আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে!

তখন তিনি বলেন,

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ؟!

'আমি কি একজন কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার বান্দা হবো না।'

---

[১৫৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩০৯।

শেষ অসিয়ত

কোনো বিষয় তাঁকে বিচলিত করলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বলতেন,

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلاَلُ ! أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلاَلُ!

'হে বেলাল, নামাজের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্তি দান কর। নামাজের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্তি দান কর।'

তিনি আরও বলেন,

..وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ.

'নামাজের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।'

দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান মোবারক থেকে শেষ যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল-

الصَّلاَةَ.. الصَّلاَةَ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ..

'নামাজ, নামাজ এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত কথাটি কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন :

اِتَّقُوْا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

'তোমরা তোমাদের অধিনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।'

পরিশিষ্ট

শেষ কথা, এমন পরিপূর্ণ গুণ ও সৌন্দর্য, সমুন্নত স্বভাব ও চরিত্র, চিরন্তন জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের অধিকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–নবী না হলে; বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী না হলে, আর কে হতেন? তিনি ছাড়া অন্য কারও দ্বারা কি বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণ ও আশীর্বাদস্বরূপ নবুয়ত ও রেসালাতের মহান এই ধারার সমাপ্তি টানা যেত? অন্য কাউকে দিয়ে কি এর যথার্থতা প্রমাণিত হতো?

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি একথা স্বীকার করে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা তার কতিপয় বান্দাকে নবুয়তের জন্য নির্বাচিত করেন ও তাদের রেসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন, তাহলে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এমন মহামানবের নবী ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা ছাড়া তারা কীভাবে তাদের নবীদের নবুয়ত প্রমাণ করবে? সেটি প্রমাণ করার জন্য হলেও নবীজীর নবুয়তের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক।

মানবজাতির ওপর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অসীম অনুগ্রহ এবং আল্লাহর অশেষ দয়ায় মানবতার কল্যাণে তাঁর রেখে যাওয়া যে শ্রেষ্ঠ বিশাল মানবকাফেলা–এগুলো নবুয়তের কীর্তি না হলে আর কী হতে পারে?

মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবদান রেখে গিয়েছেন, চিরস্থায়ী শান্তি ও সফলতা এবং চিরমুক্তির যে চাবি তাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন, পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী কি তা করে যেতে সক্ষম হয়েছেন? তাঁর অবদানকে কি অন্যান্য নবীদের অবদানের সঙ্গে পরিমাপ করা সম্ভব?

আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাত।'[১৫৭]

[১৫৭] সূরা আহযাব : ৪০।

তথ্যসূত্র

১. আল কোরানুল কারীম
২. তাফসিরে ইবনে কাসির
৩. তাফসিরে ইবনে জারির
৪. তাফসিরে আলুসি
৫. আল্লামা আইনি ও হাফেজ ইবনে হাজার কৃত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ অবলম্বনে সহীহ বুখারী
৬. ইমাম নববীর ব্যাখ্যাকৃত সহীহ মুসলিম
৭. সুনানে আবি দাউদ
৮. সুনানে নাসায়ী (আল্লামা সুয়ূতী ও সিনদি ব্যাখ্যাকৃত)
৯. ইবনে আরাবীর ব্যাখ্যাকৃত সুনানে তিরমিযী
১০. সুনানে ইবনে মাযাহ
১১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক
১২. মুয়াত্তা ইমাম আহমাদ
১৩. মুসতাদরাকে হাকেম
১৪. আল্লামা ইরাকীর আল-কুরব ফি ফাযলিল আরাব
১৫. ইমাম তিরমিযী কৃত শামায়েলে মুহাম্মাদিয়্যাহ
১৬. সিরাতে ইবনে হিশাম
১৭. ইবনে সাদ কৃত তাবাকাতুল কুবরা
১৮. আবু নুআইম কৃত দালাইলুন নাবুওয়াহ
১৯. আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ
২০. আল্লামা কাজি ইয়ায কৃত আশ-শিফা
২১. শারহুশ শিফা
২২. আল্লামা সুয়ূতী কৃত আল খাসাইসুল কুবরা
২৩. ইবনুল কাইয়িম কৃত জালাইলুল আফহাম
২৪. যাহাবী কৃত তারিখুল ইসলাম
২৫. ইবনে কাছির কৃত আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

২৬. ইবনে হাজার কৃত আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিয সাহাবাহ

২৭. আল্লামা সুয়ূতী কৃত তারিখুল খুলাফাহ

২৮. জাদুল মাওলা কৃত মুহাম্মাদ আল-মাছালুল আ'লা

২৯. শাইখূল ইসলাম মুসতাফা আস-সাবরি কৃত আল-কাওলুল ফাসল

৩০. আল্লামা ইরাকী কৃত আল-কুরব ফি ফাসলিল আরাব

৩১. আল্লামা মুহাম্মাদ যাহেদ কাওছারী কৃত যিকরল মাওলা

৩২. খিযির হুসাইন কৃত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সা.

৩৩. আল্লামা মাহমুদ পাশা ফালাকি কৃত নাতাইযুল আফহাম

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের আরো কিছু বই

১. সালাতে খুশু খুজুর উপায়

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

২. কুফর থেকে সাবধান

[শায়খ আবু হামজা আল-মিশরী]

৩. সিফাতুর রাসুল সা.

[আহমাদ মুস্তোফা কাসেম আত-তাহতাভী]

৪. আন্তরিক তাওবা

[আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজি রহ.]

৫. হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়

[শাইখ মুস্তফা আহমাদ মুতাওয়াল্লী]

৬. তাওহিদ ও শিরক : প্রকার ও প্রকৃতি

[শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ]

৭. আঁধারে আলোর জোছনা

[আইনুল হক কাসিমী]

[মুহাম্মাদ আবু ওমর]

৮. মিরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

[ড. মো: আবুল কালাম আজাদ]

৯. খুতুবাতে মাদরাজ

[সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.]

১০. মুনাফিকি থেকে বাঁচার উপায়

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১১. ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি হবে কি?

[শাইখ মুহাম্মাদ আল আবদাহ্]

১২. ইমাম তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন

[মুফতি যুবায়ের খান]

১৩. এসো ঈমান মেরামত করি

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১৪. যেসকল হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
১৫. তাফসিরে সুরা তাওবা (দ্বিতীয় খন্ড)
[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]
১৬. আসক্তি : সমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
১৭. হে বোন! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়
[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]
১৮. শামের বিস্ময়কর সুসংবাদ
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
১৯. মিনারের কান্না
[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]
২০. সালাত : মুমিনের প্রাণ
[শাইখ ড. শুয়াইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ]
২১. সালাত : উম্মাহ্‌র ঐক্য
[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]
২২. আমি তাওবা করতে চাই...কিন্তু!
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
২৩. সমকামিতা : মহাপাপ
[শাইখ ইয়াহইয়া বিন মুসা আয্ যাহরানী]

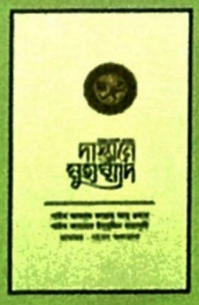
প্রকাশের পথে

১. আকসার অশ্রু
[শাইখ আবু লুবাবা শাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ]
২. হারামাইনের আর্তনাদ
[শায়খ আবু লুবাবা শাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ]
৩. কিতাবুত তাওহিদ
[ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব রহ.]

প্রকাশনা সংখ্যা-৩৩

যে কারণে বইটি অনন্য

- আমাদের প্রিয় নবীর পূর্ণ জীবনের সারসংক্ষেপ সহজ ও সাবলীল ভাষায় পরম মাধুর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- অত্যন্ত নান্দনিকভাবে নবীজীর আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর অনুপম দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- সীরাত সম্পর্কে নির্ভেজাল ও সত্য জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিটি বর্ণনা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থসমূহের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
- নবীজীর ওপর আরোপিত তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কিছু অসাড় ও অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে সহজ ও ঋজু ভাষায়, যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনায়।
- নববী আদর্শে আলোকিত হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে রচিত এ বইটি এক বসায় পড়ার মতো সেরা আয়োজন।



আর-রিহাব
পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]
কওমী মার্কেট (২য় তলা)
৬৫-৬৬/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার
fb.com/arrihabpub : www.arrihab.com

Price : 340